এবেলা-ওবেলার গল্প

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি. এ.

প্রকাশক

বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিঃ

স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী

৫নং কলেজ স্কোয়ার—কলিকাতা :

পাটুয়াটুলী—ঢাকা

চিত্র-শিল্পী

শ্রীফণীভূষণ গুপ্ত

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩৪৩

আট আনা

কলিকাতা

৫নং কলেজ স্কোয়ার

শ্রীনারসিংহ প্রেসে

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত

উপহার

এই লেখকের লেখা

—বড়দের জন্য—

বিষের হাওয়া···১৷০

মালঞ্চের ফুল ১৲

লিপিদাস···৷৵০

—ছোটদের জন্য—

সাবিত্রী···৷৷০

টুলটুল···৷৵০

ফুলঝুরি···৷৷০

তাই তাই······৷৷৵০

ময়ূরপঙ্খী···৷৷০

চরকা-বুড়ী···৷৷০

তেপান্তরের মাঠ···৷৷০

সাতরাজ্যের গল্প···৷৷০

সোনার কাঠি রূপার কাঠি···৷৷০

তে-রাত্তিরের তাইরে-নাইরে-না ··৷৷০

সূচীপত্র
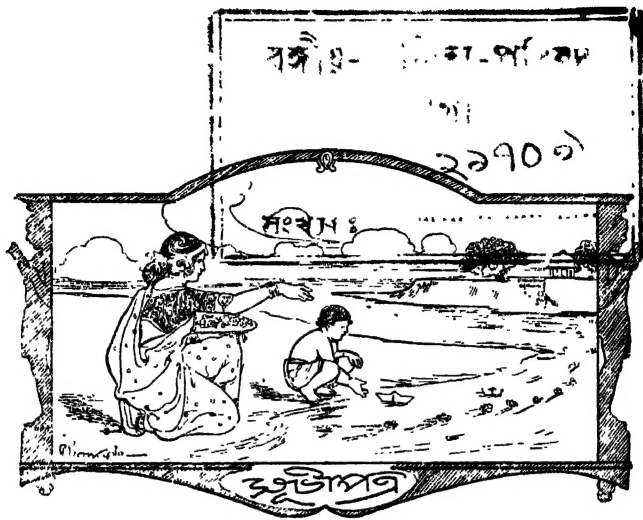
'কান-কাটা রাজা' আর 'আক্কেল গুড়ুম' ১৩৩৯ শালের শিশুসাথীতে, 'বেরাল কেন ইঁদুর খায়' আর 'আষাঢ়ে গল্প' ১৩৩৮ ও ১৩৩৯ শালের পাপিয়ায়, 'গদুর কাণ্ড' আর 'ধর্ম্মের কল' ১৩৩৮ ও ১৩৩৯ শালের রামধনুতে বের হয়েছিল; বাকী তিনটী লেখার মধ্যে 'এক-ঠেঙ্গে বগা' ও 'হেবোর হাকিমী' দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ছোটদের বার্ষিকীতে, আর 'বোক-চাঁদের হাট' সপ্তম-বার্ষিক-শিশুসাথীতে ছাপা হয়েছিল।

প্রকাশক

কান-কাটা রাজা

কান-কাটা রাজা

কিষ্কিন্ধ্যার রাজা স্কন্ধমাণিক।

দিনের বেলায় উজীর-নাজীর-দরবারীদের নিয়ে রাজার রাজ-দরবার চলে। সন্ধ্যার সময় দরবার ভেঙ্গে যায়,—স্কন্ধমাণিক সোনার মুকুট খুলে রেখে মস্ত-বড় পাগ্‌ড়ী মাথায় বাঁধেন, আর মালকোচা এঁটে কাপড় প'রে বাঁশের লাঠি কাঁধে ফেলে রাতের অন্ধকারে রাজপুরী হ'তে বের হ'য়ে যান। রাজার উজীর-নাজীরের দলও, ঢাল্‌-তরোয়াল হাতে

ক'রে মশাল জ্বেলে রৈ-রৈ শব্দ ক'রে রাজার পেছন পেছন ছোটেন। সারা রাত রাজ্যের এদিক-ওদিক ঘুরে লুট-তরাজ ক'রে যা পান তাই নিয়ে ভোর না-হ'তেই সবাই রাজপুরীতে ফিরে আসেন। তারপর আবার তাঁরা রাজসভার পোষাক প'রে দিনের দরবার জমান। দিনের বেলার রাজাই যে রাতে হন ডাকাতের সর্দ্দার, তা চিনেই বা কে, আর সে ডাকাতের খোঁজ পায়ই বা কার সাধ্য ?

রাজ্যের লোক রোজ রাজ-দরবারে এসে কেঁদে পড়ে; বলে—'মহারাজ, সর্ব্বনাশ হ'লো! ডাকাতের জ্বালায় ভিটেয় টেকার জো নেই।'

'আচ্ছা, আমি দেখ্‌চি'—ব'লে স্কন্ধমাণিক সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বিদায় দেন। তারপর তারা চ'লে যেতেই উজীরের দিকে চেয়ে মুচ্‌কি হেসে দরবারের কাজে মন দেন।

এ-ভাবে দিনের পর দিন যায়। রাজার দুয়ারে কেঁদে-কেটেও ফল হয় না, এদিকে ডাকাতিরও কম্‌তি নেই,—প্রাণের দায়ে রাজ্যের লোকেরা নিজেরাই দল বেঁধে ডাকাত ধরার ফিকির আঁট্‌ল। এরপর যাই-না পথে রৈ-রৈ শব্দ ওঠে, অম্‌নি লোকজনেরাও লাঠিসোটা নিয়ে মার্ মার্ ক'রে ছুটে যায়। তাড়ার চোটে ডাকাতের দলের তখন আর ফিরে পালাবার পথ থাকে না।

বেগতিক দেখে স্কন্ধমাণিক উজীরকে বল্‌লেন—'উজীর, এ তো ভারী মুস্কিল হ'লো দেখ্‌চি। রাজ্যের ব্যাটারা সবাই সেয়ানা হ'য়ে উঠেচে! ডাকাতি কর্‌তে গিয়ে শেষে কি তাদের হাতে ধরা পড়্‌ব! তার চেয়ে তুমি আর-একটা উপায় ঠাওরাও দেখি—কি করা যায়!'

উজীর সারা দিন ভেবেচিন্তে সন্ধ্যার আগে রাজাকে বল্‌লেন—'মহারাজ, উপায় একটা ঠাউরিয়েচি। এখন আর-একটা কাজ করা যাক্‌। সে কাজটা চল্‌বেও নির্ঝঞ্ঝাটে, আর ধরা না পড়্‌লে ওর মত বড় কাজও খুব কম আছে।'

উৎসুক হ'য়ে রাজা বল্‌লেন—'কাজটা কি, বলো দেখি।'

উজীর বল্‌লেন—'আজ্ঞে, চুরি। শেষ-রাত্তিরের কাজ,—লোকজনের হৈ-চৈ নেই, ঢাল-তরোয়ালেরও দরকার নেই,—হাতে শুধু একটা সিঁদ্‌-কাঠি থাক্‌লেই হ'লো। তার ওপর আরো একটু হুঁসিয়ারীর দরকার হয় তো, কোটালকে হুকুম কর্‌লেই চল্‌বে,—সে একটু আগে গিয়ে ঘাঁটি আগ্‌লিয়ে থাক্‌বে,—তখন আর কে কার খোঁজ পায়?'

উজীরের কথা শুনে রাজা ভারী খুশী! মনের আহ্লাদে সিংহাসনের ওপর দু থাপ্পড় মেরে তিনি ব'লে উঠ্‌লেন—'বহুৎ আচ্ছা!'

... ...

শেষ-রাতে রাজা-উজীর পোষাক ছেড়ে নেংটী পরেন, আর সারা গায়ে তেল মেখে সিঁদ্-কাঠি নিয়ে বেরোন।

কোটাল পথের অন্ধকারে চুপটী ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে ঘাঁটি আগ্‌লান। সিঁদ্ কেটে লোকজনের ঘর থেকে টাকাকড়ি এনে রাজা-উজীর-কোটাল ভোরবেলা রাজপুরীতে ফিরে আসেন। তারপর আবার তাঁরা রাজসভার পোষাক প'রে দিনের দরবার জমান। দিনের বেলার রাজাই যে রাতে হন সিঁদেল-চোর, তা চিনেই বা কে, আর সে চোরের খোঁজ পায়ই বা কার সাধ্য?

রাজ্যের লোক রোজ রাজ-দরবারে এসে কেঁদে পড়ে;

বলে—'মহারাজ, সর্ব্বনাশ হ'লো! চোরের জ্বালায় ভিটেয় টেকার জো নেই।'

'আচ্ছা, আমি দেখ্‌চি'—ব'লে স্কন্ধমাণিক লোকজনকে আশ্বাস দিয়ে বিদায় দেন। তারপর তারা চ'লে যেতেই উজীরের দিকে চেয়ে মুচ্‌কি হেসে দরবারের কাজে মন দেন।

এ-ভাবে দিনের পর দিন যায়। রাজার দুয়ারে কেঁদে-কেটেও ফল হয় না, এদিকে চুরিরও কম্‌তি নেই—প্রাণের দায়ে রাজ্যের লোকেরা নিজেরাই চোর ধরার ফিকির আঁট্‌ল। তারা এক-একজনে এক-একটা বাঘা-কুকুর কিনে এনে ঘরের দুয়ারে বেঁধে রাখ্‌ল। তখন আর সে-সব ঘরের কাছে যায় কার সাধ্য! মানুষের পায়ের শব্দ শুন্‌লেই বাঘা-কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে ওঠে। কুকুরের ডাকে গেরস্তদের ঘুম ভেঙে যায়। রাজা-উজীরের তখন আর ফিরে পালাবার পথ থাকে না।

বেগতিক দেখে স্কন্ধমাণিক উজীরকে বল্‌লেন—'উজীর, চুরির সুবিধে আর চল্‌চে কই? রাজ্যের ব্যাটারা সব শয়তান হ'য়ে উঠেচে! চুরি কর্‌তে গিয়ে শেষে কি তাদের হাতে ধরা পড়্‌ব! তার চেয়ে তুমি আর-একটা উপায় ঠাওরাও দেখি—কি করা যায়!'

উজীর সারা দিন ভেবেচিন্তে সন্ধ্যার আগে রাজাকে

বল্‌লেন—'মহারাজ, উপায় একটা ঠাউরিয়েচি। কাজটা ক'রে মনের সুখও হবে, আর মোলায়েম হাতে কাজ চালাতে পার্‌লে লাভও আছে বিলক্ষণ!'

উৎসুক হ'য়ে রাজা বল্‌লেন—'কাজটা কি, বলো দেখি।'

উজীর বল্‌লেন—'আজ্ঞে, গাঁট-কাটা। তেমন কোনো হাতিয়ার-ফাতিয়ারের দরকার নেই, হাতে শুধু থাক্‌লেই হ'লো ছোট্ট একখানা ছুরী বা কাঁচি; আর পথ-ঘাট দিন-রাত্তিরেরও বাচ-বিচার নেই, তাক বুঝে একটীবার একটী পোঁচ মার্‌লেই হ'লো—ক্যাঁচ্‌! ব্যস্‌!—তারপরই হাত-ভর্‌তি সওগাদ-কে সওগাদ, রূপেয়া-কে রূপেয়া!'

গাঁট-কাটার কথা শুনে রাজার মন দ'মে গেল। তিনি ই-য়ে ই-য়ে ক'রে জবাব দিলেন—'কিন্তু, উজীর, ও-কাজটা একটু ইতরগোছের নয়? পথে-ঘাটে দিনরাত্তির ছত্রিশ-জাতের গা ঘেঁসে ব্যবসাটা চালাতে হবে,—অমন নোংরা কাজে শেষে হাত দেবো!'

'রামো!'—ব'লে উজীর জিভ কাট্‌লেন;—বল্‌লেন—'ও-কাজ কি আর আপনার নিজের হাতে কর্‌তে হবে, হুজুর! কাজ চালাবে কোটাল-ভায়া। তাকে তো রাজ্যের খবর-দারাতে হামেশাই ছত্রিশ-জাতের সঙ্গে মিশ্‌তে হয়,—তখন কাঁচি চালাবার সুবিধেও হবে তারই।'

রাজা খুশী হ'য়ে বল্‌লেন—'বেশ। তা হ'লে কোটালকে সব বুঝিয়ে বলো,—আজ হ'তেই সে কাজে লেগে যাক্‌।'

উজীর কোটালকে রাজার হুকুম জানালেন। কোটাল কাপড়ের তলে একখানা কাঁচি লুকিয়ে নিয়ে রোঁদ ফির্‌তে বেরুলেন।

কোটাল্‌ চড়া-ধাতের লোক—কথা যখন বলেন তখন তাঁর হেঁড়ে-গলায় গণ্ডা-দুই কাঁসর বাজে, হাত যখন চালান তখন লাঠির চোটে বিশটা মাথা ফাটে। মুখ বুজে চুপচাপ ক'রে গাঁট-কাটার মিহি কাজে তাঁর দম আট্‌কে আসে। কিন্তু রাজার হুকুম,—এড়াবার তো জো নেই! তবু কাঁচি চালাতে গিয়ে এক-এক সময়ে তাল ঠিক থাকে না—হাতের জোরে কাঁচির ফলা লোকজনের পাঁজরের ভেতর ঢুকে যায়। লোকজনেরা ব্যথা পেয়ে—'ও মাঃ!'—ব'লে ফিরে গ্যাখে—পাশে রাজার কোটাল! কোটালকে সন্দেহ করে সাধ্য কার? লোকজনেরা কিছু বুঝ্‌তে না পেরে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে চাইতে চাইতে দূরে স'রে যায়। গাঁট কেটে টাকাকড়ি যা জোটে তাই নিয়ে কোটালও তখন স'রে পড়েন। তারপর সন্ধ্যার পর, দিনের রোজগার একসঙ্গে নিয়ে উজীরকে বুঝ দেন।

এ-ভাবে দিনের পর দিন যায়। গাঁট-কাটার উৎপাতে

রাজ্যের লোকের পথ-চলা দায়। রাজার দুয়ারে কেঁদে-কেটেও কোনো ফল হয় না। লোকজনেরা যুক্তি ক'রে সবাই মিলে এক কাপালিক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে ধর্ণা দিল।

এই কাপালিক সন্ন্যাসী থাক্‌তেন স্কন্ধমাণিক-রাজার রাজ্যের বাইরে—অজগর এক জঙ্গলের মধ্যে। মড়ার মাথার ঘিয়ে আগুন জ্বেলে তার সাম্‌নে চোখ বুজে তিনি ব'সে থাক্‌তেন। সবাই বল্‌ত—'সন্ন্যাসী-ঠাকুর, সিদ্ধপুরুষ, মনে কর্‌লে যা-খুশী তা-ই কর্‌তে পারেন।'

রাজ্যের লোকজনেরা কাপালিকের পায়ে প'ড়ে কেঁদে জানাল—'বাবা-ঠাকুর, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। গাঁট-কাটার জ্বালায় এখন আর রাজ্যে থাকার উপায় নেই।'

লোকজনের কান্নাকাটি শুনে কাপালিক চোখ মেল্‌লেন

তারপর একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে 'হ্রীং ফট্' ব'লে কি-সব আওড়াতে লাগ্‌লেন। শেষে বল্‌লেন—'আমি রক্ষা-মন্ত্র প'ড়ে দিলুম, তোরা বাড়ী ফিরে যা। কাল থেকে গাঁট-কাটার উৎপাত থাক্‌বে না।'

লোকজনেরা ফিরে যাওয়ার আগে কাপালিককে ধ'রে পড়্‌ল; বল্‌ল—'ঠাকুর, দয়া কর্‌লেন তো, আরো একটু দয়া চাই। এই গাঁট-কাটাটী কে, একবার ব'লে দিন্।'

কাপালিক বল্‌লেন—'গাঁট-কাটাকে চিন্‌তে চাস্? বেশ, দাঁড়া তবে আর-একটুকু।'—এই-না ব'লে ফের তিনি 'হ্রীং ফট্' ব'লে কি-সব আওড়াতে লাগ্‌লেন। তারপর তাদের দিকে ফিরে বল্‌লেন—'যা, বাঁধন-মন্ত্র প'ড়ে দিলুম, সব ব্যাটারা এক সঙ্গেই বাঁধা পড়্‌বে। কিন্তু চুণোপুঁটির খবর জেনে আর কি হবে?—একেবারে পালের গোদাকেই চিন্‌তে পার্‌বি। আজ সন্ধ্যার সময় তোদের রাজার রাজসভায় একবার যাস্, সেখানে গিয়ে দেখ্‌বি যার কান কাটা,—ডাকাত বলিস্, চোর বলিস্, আর গাঁট-কাটা বলিস্,—বুঝ্‌বি সবার মূলেই সেই ব্যাটা।'

সন্ন্যাসীর কথায় নিশ্চিন্দি হ'য়ে লোকজনেরা বাড়ী ফির্‌ল।

... ...

পথে লোকজনদের না পেয়ে সেদিন কোটালের মনে

সোয়াস্তি ছিল না। নিরাশ-মনে বেলাবেলিই তিনি খালি-হাতে রাজসভায় ফিরে গেলেন।

অসময়ে কোটালকে ফির্‌তে দেখে রাজা-উজীর দুজনেই অবাক্! উজীর ইসারায় কোটালকে কাছে ডেকে তাঁর মুখের কাছে কান নিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লেন—'ব্যাপার কি?'

ব্যাপার কি শোনার জন্য রাজারও তর সইছিল না। তিনিও ঘাড় বাঁকিয়ে উজীরের থুৎনি ঘেঁসে কান্ খাড়া ক'রে কোটালের কথা শুন্‌তে লাগ্‌লেন।

উজীরের কানে কানে কথা ব'লে কোটাল ফির্‌তে গিয়ে আর ফির্‌তে পারেন না। উজীরের কানে নাক ঠেকিয়ে তিনি কথা বল্‌ছিলেন, মুখ ফিরাতে গিয়ে ছ্যাখেন—নাকের ডগা ঘণ্টার দোলকটীর মত উজীরের কানে আট্‌কে গিয়েচে!

উজীর একমনে কোটালের কথাই শুন্‌ছিলেন, কোটালের মুখের দিকে তাকাবার খেয়াল ছিল না। কোটাল খালি হাতে ফিরে এসেচেন দেখেই তাঁর মন একে চ'টে ছিল, তার ওপর কথা শেষ ক'রেও কোটাল দাঁড়িয়েই আছেন দেখে তিনি ধম্‌কে উঠ্‌লেন—'কীর্ত্তি তো আজ খুব হয়েচে! যাও না, এখন স'রে যাও না, নাকের ডগাটা দিয়ে মিছিমিছি কানে অত সুড়সুড়ি দিচ্ছ কেন?'—এই ব'লেই তিনি নিজের মুখ ঘুরালেন। কিন্তু মুখ ঘুরাতে গিয়ে উজীর

ত্যাখেন—কি বিপদ! রাজার কানের সঙ্গে তাঁর থুৎনির দাড়ি কাঁঠালের আটার মত লেপ্‌টে পড়েচে!

রাজা বল্‌লেন—'উজীর, মুখখানাকে চর্‌কার মত ঘুরাচ্ছ কেন?—তোমার দাড়ির খোঁচায় যে প্রাণ যায়!'

উজীর বল্‌লেন—'তাই তো, মহারাজ! ব্যাপারটা কি হ'লো!'

রাজা-উজীর-কোটাল তিনজনেরই তখন মহামুস্কিল। রাজা যাই মুখ ফিরান, উজীর তাঁর দাড়ির গোড়া চেপে ধ'রে বলেন—'উহুঁ! উহুঁ!' উজীর যাই মুখ ঘুরান, কোটাল বলেন—'বাবা রে! গেলুম রে!' রাজার কানে উজীরের দাড়িতে বাঁধা, উজীরের কানে কোটালের নাকে খিল-

লাগানো—কাপালিকের বাঁধন-মন্ত্রের ফলে টেনেও তা আল্‌গা করে কার সাধ্য ?

রাজা বল্‌লেন—'উজীর, এখন উপায় ?'

উজীর বল্‌লেন—'মহারাজ, এখন এক উপায় ছাড়া তো আর পথ দেখি না। কোটালকে হাতের কাঁচিখানা বের কর্‌তে বলুন,—তাই দিয়ে সে তাঁর নাকের ডগাটী কেটে ফেলুক্ ; আমিও আমার দাড়িটা নয় ছেটে ফেলি ; আর আপনিও'...আম্‌তা আম্‌তা ক'রে উজীর বল্‌লেন—'মহারাজ, ভয়ে বল্‌ব, না, নির্ভয়ে বল্‌ব ?'

রাজা বল্‌লেন—'উজীর, তোমার দরবারী কায়দা-ফায়দা রেখে দাও,—আগে পষ্ট ক'রে বলো কিসে এ বিপদের মুক্তি।'

উজীর বল্‌লেন—'মহারাজ, তা হ'লে আপনার কান-খানাকেও আপনার নিজের হাতেই কাট্‌তে হচ্ছে !'

'এ্যাঃ !'—ব'লে রাজা লাফিয়ে উঠ্‌লেন ; বল্‌লেন—'শেষে নিজের হাতেই নিজের কান কাট্‌তে হবে, উজীর !'

উজীর বল্‌লেন—'নইলে আর উপায় কি ! আর, এতে ভয়ের কারণই বা কি ! শুধু একখানা কান কাটা বই তো নয় ! পরে মাথায় বাব্‌রি-চুল রাখ্‌লেই কাটা কান ঢাকা পড়্‌বে !'

কোটাল কাঁদো-কাঁদো মুখে বল্‌লেন—'কিন্তু আমার নাক গেলে তা ঢাকার উপায় কি ?'

উজীর বল্‌লেন—'তার জন্যেই বা চিন্তা কি! এতদিন যাঁর নিমক খেলে সেই সরকারই তার উপায় কর্‌বেন। বাজারে মোমের অভাব নেই,—সরকারী খরচায়ই নয় তোমার কাটা নাক জোড়ানো যাবে।'

রাজা বল্‌লেন—'উজীর, তা হ'লে, দেখ্‌চি, লোকসানটা শুধু আমার আর কোটালের ওপর দিয়েই গেল। তোমার বেলা শুধু দাড়ির ওপর দিয়েই ফাঁড়া!'

উজীর মনে মনে বল্‌লেন—সাধে কি আর উজীরের দাড়ি রাখার নিয়ম! কিন্তু রাজার মুখের ওপর তো সে কথা বলা চলে না—মুখ বুজে শুধু দাড়ির ওপরই তিনি হাত বুলাতে লাগ্‌লেন।

... ...

এদিকে কাপালিকের কথা-মত রাজ্যের লোকজনেরাও তখন ভিড় ক'রে দরবারে এসে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

তাদের আস্‌তে দেখে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে কোটাল হাতের কাঁচি বের কর্‌লেন; আর তা দিয়ে ঘ্যাঁচ্‌ ক'রে তখনই নিজের নাকের ডগাটা কেটে ফেল্‌লেন। সেটা দুলের মত উজীরের কানের ওপর ঝুল্‌তে লাগ্‌ল। কোটালের হাতের কাঁচি নিয়ে উজীরও নিজের দাড়ি ছেঁটে ফেল্‌লেন। আর রাজা স্কন্ধমাণিক?—নিরুপায় হ'য়ে তাঁকেও সেই কাঁচি দিয়ে নিজের হাতে নিজের কান কাট্‌তে হ'লো।

তারপর ছাড় পেয়ে যে যার মুখ ঢেকে রাজসভা ছেড়ে ছুটে পালালেন।

... ...

রাজ্যের লোকজনেরা ততক্ষণে হুড়মুড় ক'রে সিংহাসনের কাছে এসে পড়েচে। সেখানে এসে দ্যাখে—সাদা চামরের মত একগোছা দাড়ি, আর তাতে জড়ানো কুণ্ডল-পরা একখানা কান মাটিতে প'ড়ে রয়েচে!

কাটা কানের কুণ্ডল দেখে কারুর বুঝ্‌তে বাকী রইল না—এতদিনের চোর ডাকাত আর গাঁট-কাটার সর্দ্দার কে!

বেড়াল কেন ইঁদুর খায়

বেরাল কেন ইঁদুর খায়

বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দা আর ইঁদুর-পিসির ঠাকুমা—দুজনে পাড়াপড়্শী। এক অজগর-বনের মধ্যে তাদের বাসা। বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দা থাকে গাছের আগডালে, আর ইঁদুর-পিসির ঠাকুমা থাকে গাছের গোড়ায়। বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দা গাছের ওপরের পাখীটা-আস্টা মেরে খায়; ইঁদুর-পিসির ঠাকুমা গাছের তলায় ঘুরে ঘুরে ফল-পাকোর খুঁটে খায়।

কিন্তু এ-ভাবে ক'দিন চলে? গাছের পাখী হুঁসিয়ার হ'লো—বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দার ছায়া দেখলেও ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে পালায়। আর বারমাস ত্রিশদিন তো গাছের ফল ফলে না, ইঁদুর-পিসীর ঠাকুমার খাওয়া জোটে কিসে?

দুজনেরই মহাভাবনা। বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দা বল্‌ল—'বলো তো, দিদি, এখন কি করি?' ইঁদুর-পিসির ঠাকুমা বল্‌ল—'তাই তো, পড়্‌শী! এ বনে তো আর থাকার জো নেই দেখ্‌চি।'

দুজনে ক'দিন ধরে যুক্তি-পরামর্শ কর্‌তে লাগ্‌ল। তিনদিন তিনরাত যুক্তির পর ঠিক হ'লো—বন ছেড়ে তারা শহরে যাবে। সেখানে লাখো লাখো মানুষ থাকে, তাদের দুটী লোকের খাওয়ার অভাব কি?

এরপর দুজনে মোটঘাট মাথায় ক'রে শহরের দিকে রওনা হ'লো।

ঝোপ-জঙ্গল ছেড়ে তারা কিছুদূর যেতে না-যেতেই সাম্‌নে দ্যাখে এক খাল। খাল দেখে দুজনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়্‌ল—সর্ব্বনাশ! এ যে এক সমুদ্দুর! এখন এ সমুদ্দুর পার হওয়ার উপায় কি?

আবার তিনদিন তিনরাতের মধ্যে দুজনের যুক্তি থামে না। চারদিনের দিন বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দা হঠাৎ দ্যাখে—খালের পারে আধখানা তরমুজের খোলা। মহা-আহ্লাদে সে ইঁদুর-পিসির ঠাকুমাকে সেই খোলা দেখিয়ে বল্‌ল—'ঐ যে একখানা নৌকো! এস, ঐ নৌকোয় চ'ড়ে সমুদ্দুর পার হই।'

বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দা আর ইঁদুর-পিসির ঠাকুমা দুজনে তখন হেঁইয়ো হেঁইয়ো ক'রে তরমুজের খোলাখানি ঠেলে

খালের জলে ভাসাল। তারপর সেই খোলার ভেতর দুজনে চ'ড়ে বস্‌ল।

তরমুজের খোলার ভেতর দুজনে চলেচে তো চলেচেই—কোথায় খালের আর-পার, আর কোথায়ই বা শহর? তিনদিন তিনরাতের মধ্যে কারু পেটে খাবার পড়েনি—খিদেয় দুজনেরই পেট চুঁই চুঁই কর্‌তে লাগ্‌ল।

বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দা বল্‌ল—'দিদি! খিদেয় যে পেট জ্ব'লে যায়! চোখে যে আঁধার দেখ্‌চি!

ইঁদুর-পিসির ঠাকুমা বল্‌ল—'তাই তো, পড়্‌শী! ব্যাপার তো বড় কঠিন হ'লো! তা, এস না, দুজনে ক'ষে ঘুম লাগাই। ঘুমের মাঝে খিদের জ্বালা থাক্‌বে না, আর ততক্ষণে হয় তো সমুদ্দুর পার হ'য়ে ও-পারে গিয়েও পৌছব।'

ঘুমোনোই ঠিক হ'লো। দুজনে তরমুজের খোলার ভেতর শুয়ে পড়্‌ল। বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দা শুয়ে রইল একদিকে—লেজ গুটিয়ে গুটিস্থুটি মেরে; আর ইঁদুর-পিসির ঠাকুমা শু'ল আর-একদিকে—সটান উপুড় হ'য়ে।

দুটীতেই চোখ বুজে প'ড়ে আছে। কিন্তু পেটে খিদের জ্বালা—চোখ বুজ্‌লেই কি আর, ছাই, ঘুম আসে? ইঁদুর-পিসির ঠাকুমার আবার রোগ—ভরা পেট না হ'লে চোখের পাতা বোজে না। সে ঘুমুবে কি? একবার চোখ বোজে তো দশবার কুৎ কুৎ ক'রে চায়।

বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দার পেটেও খিদের জ্বালা কম নয়। কিন্তু তার অভ্যেস একবার চোখ-তুটী বুজ্‌ল তো অমনি নাক ডাকিয়ে ঘুঙ্গুর ঘুর ঘুঙ্গুর ঘুর! শুয়ে তু-একবার হাই তুল্‌তে না-তুল্‌তেই সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

ইঁতুর-পিসির ঠাকুমা যখন শুন্‌ল—পড়্‌শীর নাক ডাকাচ্ছে ঘুঙ্গুর ঘুর ঘুঙ্গুর ঘুর, তখন সে নিশ্চিন্দি হ'য়ে কুট্‌ কুট্‌ কুটুর কুট্‌ ক'রে তরমুজের খোলা কেটে খেতে লাগ্‌ল।

ঘুমের ঘোরে কুট্ কুট্ কুটুর কুট্ শব্দ শুনে বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দা কান খাড়া ক'রে জেগে উঠ্‌ল। কিন্তু সে মাথা তুল্‌তে না-তুল্‌তেই ইঁদুর-পিসির ঠাকুমা চোখ বুজে মরার মত প'ড়ে রইল। বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দা দু-একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে ভাব্‌ল—'নাঃ! কিছুই তো নয়! বুঝি স্বপ্ন দেখেচি!'—এই-না ভেবে চোখ বুজে আবার সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

একটু পরে ফের আবার কুট্ কুট্ কুটুর কুট্! পড়্‌শীর নাক ডাকাচ্ছে শুনে ইঁদুর-পিসির ঠাকুমা নিশ্চিন্দি-মনে আবার তরমুজের খোলা কেটে খেতে লাগ্‌ল।

শব্দ শুনে বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দা আবার চম্‌কে উঠ্‌ল। কিন্তু সে মাথা খাড়া করতে না-করতেই ইঁদুর-পিসির ঠাকুমা চোখ বুজে মরার মত প'ড়ে রইল। বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দা দু-একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে ভাব্‌ল—'নাঃ! কিছুই তো নয়। বুঝি স্বপ্ন দেখেচি!'—এই-না ভেবে চোখ বুজে আবার সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল!

এরপর আর-একবার কুট্ কুট্ কুটুর কুট্ শব্দ হ'তেই তরমুজের খোলা ফুটো হ'য়ে গেল। আর তক্ষুণি গল্ গল্ ক'রে জল উঠে তরমুজের খোলা খালের জলে ডুবে গেল।

ইঁদুর-পিসির ঠাকুমা আগেই সাঁত্‌রে ও-পারে গিয়ে উঠ্‌ল। বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দা ঘুমের ঘোরে জলে প'ড়ে

খানিক নাকানি-চুবুনি খেল ; তারপর সে-ও সাঁত্‌রে খাল পার হ'য়ে গেল।

পারে উঠে বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দার রাগ থামায় কে ? সে চোখ রাঙিয়ে ইঁদুর-পিসির ঠাকুমাকে বল্‌ল—'এতক্ষণে বুঝ্‌লুম কুট্‌ কুট্‌ কুটুর কুট্‌ শব্দ হচ্ছিল কিসের ! আর ও-রকম শব্দ করেই বা কে ? বেশ ! তোমার কাজ তুমি করেচ, এবার আমার কাজ আমি করি—তোমাকে আমি খাব।'

বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দার কথা শুনে ইঁদুর-পিসির ঠাকুমার চক্ষুস্থির !—পড়্‌শী বলে কি ? তাকেই গিল্‌তে চায় ! এখন উপায় ?···

চট্‌ ক'রে ইঁদুর-পিসির ঠাকুমার মাথায় এক বুদ্ধি জোগাল ; সে বল্‌ল—'আমাকে খেতে চাও, পড়্‌শী ? বেশ তো, খাও না ! বাধা কিসের ? কিন্তু দেখ্‌চ তো—জলে ভিজে আমিও হী হী ক'রে কাঁপ্‌চি, আর তুমিও হী হী ক'রে কাঁপ্‌চ—এ সময় আমাকে খেলে কি কিছু সোয়াদ পাবে ? আমার মজ্জা পর্য্যন্ত জলে ভিজে জলো হ'য়ে গেছে যে ! আর তুমিও ভিজে-গায়ে খেতে বস্‌বে ? কোনো ভদ্দরলোক কি নেয়ে-ধুয়ে গা না পুছে কিছু খায় ? তার চেয়ে এক কাজ করি এস—আমাদের গায়ের জল আগে শুকোক্‌ ; তারপর তোমার যা-খুশী ক'রো।'

এ যুক্তি বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দার মন্দ লাগ্‌ল না। সে

বল্‌ল—'বেশ! আমি রাজী। ঐ গাছের মাথায় রদ্দুর আছে—আমি ওখানে গিয়ে গা শুকোই; আর তুমিও এই নীচে ব'সে গা শুকিয়ে নাও।'

দুজনে গায়ের জল শুকোতে গেল—বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দা গাছের আগায় চ'ড়ে বস্‌ল, আর ইঁদুর-পিসির ঠাকুমা গাছের গোড়ায় রইল।

রদ্দুরে ব'সে গা চাট্‌তে চাট্‌তে বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দার চোখ ঘুমে ঢুলে পড়্‌ল। ঘুঙ্গুর ঘুর ঘুঙ্গুর ঘুর শব্দ শুনে ইঁদুর-পিসির ঠাকুমা যখন বুঝ্‌ল পড়্‌শীর নাক ডাকাচ্ছে, তখন সে খুর্‌ খুর্‌ ক'রে গাছের গোড়ায় এক গর্ত্ত খুঁড়ে ফেল্‌ল; তারপর সুড়্‌ সুড়্‌ করে সেই গর্ত্তের ভেতর গিয়ে লুকিয়ে রইল।

বিকেল-বেলা ঘুম থেকে উঠে বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দা নীচে এসে ছাখে—ইঁদুর-পিসির ঠাকুমা কোথাও নেই। আর যেখানে সে ছিল সেখানে এ—ত্তো বড় একটা গর্ত্ত!

বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দা উঁকিঝুঁকি মেরে ছাখে গর্ত্তের মধ্যে নড়্‌চে—ঐ যে একটা ল্যাজ! ল্যাজ দেখে সে বুঝ্‌তে পার্‌ল ওটা তো আর কারুরই নয়—ইঁদুর-পিসির ঠাকুমারই।

তখন ইঁদুর-পিসির ঠাকুমার দুষ্টুমি বুঝ্‌তে পেরে বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দা চ'টে লাল! সে থাবা পেতে গর্ত্তের মুখে ব'সে রইল—একবার ইঁদুর-পিসির ঠাকুমার নাগালটা পেলে হয়!

কিন্তু ইঁদুর-পিসির ঠাকুমা সেই যে গর্ত্তে ঢুকেচে, আর তাকে বের ক'রে কে? গর্ত্ত খুঁড়ে খুঁড়ে সে দূরে পালাতে লাগ্‌ল। আর বাইরে ব'সে বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দা গর্জ্জাতে লাগ্‌ল।

এ-ভাবে অনেক দিন গেল। বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দাও গর্ত্তের মুখ হ'তে সরে না, ইঁদুর-পিসির ঠাকুমারও গর্ত্ত হ'তে বেরুবার জো নেই।

কিছুদিন বাদে এ গর্ত্তের বাইরে আর ও গর্ত্তের মধ্যে চোক ওল্‌টাল।

মরার আগে বেরাল-মাসীর ঠাকুদ্দা তার নাতি-নাত্‌নীদের কাছে ডেকে ব'লে গেল—'তোরা একটা কথা মনে রাখিস্—ঐ পাজীর জাত ইঁদুর দেখ্‌লেই ধ'রে কোঁৎ ক'রে গিলে ফেল্‌বি।'

আর ইঁদুর-পিসির ঠাকুমাও মরার আগে নাতি-নাত্‌নীদের ডেকে বল্‌ল—'খবরদার! কখনও বেরালের কাছ মাড়াস্ নে। আর ও-জাতটার কেউকে যখনই দেখ্‌বি, তখনই সুড়্ সুড়্ ক'রে গর্ত্তে গিয়ে লুকোস্।'

সেই হ'তে ইঁদুর-ভায়ারা বেরাল দেখ্‌লেই মারে ভোঁ-দৌড়। আর বেরালও ইঁদুর দেখ্‌লে ধ'রে কোঁৎ ক'রে গিলে খায়।

এক-ঠেঙে
বগা

এক-ঠেঙ্গে বগা

—১—

এক বামুন আর তাঁর বামনী। বামুন এ-বাড়ী সে-বাড়ী পূজো-আচ্চা করেন, বামনী ঘর-সংসার ছ্যাখেন। গরীবের সংসার—খেটেখুটে দিন এক-রকমে চ'লে যায়। কিন্তু বামুন-বামনীর মনে দুঃখ—তাঁদের কোন ছেলেপিলে নেই।

একদিন শেষ-রাতে বামনী স্বপ্ন ছ্যাখেন, মা-ষষ্ঠী যেন তাঁকে বল্‌চেন—'বাছা, দুঃখ করিস্‌নে—তোর ছেলে হবে, আমি বল্‌চি। কাল ভোরে বামুনকে গাঁয়ের ষষ্ঠীতলায় পাঠিয়ে দিস্‌। ষষ্ঠীতলার পেছনে আমগাছের একটা তে-ডালের মাঝের ডালটার মাথায় এক-বোঁটায় দুটো আম পেকে রয়েচে। বামুন যেন এক-নিঃশ্বাসে ডান-হাত দিয়ে

সেই ফল-দুটো পেড়ে আনে। তারপর নেয়ে-ধুয়ে সোয়ামী-স্ত্রীতে ভাগ ক'রে সেই ফল খাস্। কিন্তু, খবরদার, দুটো আমই এক-সঙ্গে পাড়া চাই, আর তাতে মাটির ছোঁয়া লাগ্‌লে কিন্তু ফল ফল্‌বে না।'

স্বপ্ন দেখেই বামনীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভোরবেলা বামুন ঘুম থেকে উঠ্‌তেই বামনী তাঁকে স্বপ্নের কথা বল্‌লেন।

আশ্বিনমাসে আমগাছে ফল!—বামুন ভাব্‌লেন—'তা-ও কি হয়!' কিন্তু মা-ষষ্ঠী স্বপ্ন দিয়েচেন—আবার শেষ-রাতের স্বপ্ন—হেলা-ছেদ্দার কথাও তো নয়! বামুন গাঁয়ের ষষ্ঠীতলার পেছনে গিয়ে আমগাছের দিকে তাকাতেই ছাখেন—সত্যিই একটা তে-ডালের মাঝের ডালটার মাথায় এক-বোঁটায় লাল-টুক্‌টুকে দুটো আম! বামুন এক-লাফে তখুনি আমগাছের ওপর চড়্‌লেন। তারপর দম বন্ধ ক'রে ডান-হাতে আমের বোঁটা ধ'রে টান দিয়েচেন, হঠাৎ হাত-ফস্‌কে একটা আম টপ্‌ ক'রে মাটিতে প'ড়ে গেল। যাঃ, সর্ব্বনাশ!···মাটির ছোঁয়া লেগেচে, ও-ফলে তো কাজ হবে না! বামুন মাটির আম মাটিতে ফেলে রেখে ডান-হাতের একটা আম নিয়েই ঘরে ফির্‌লেন।

সকাল সকাল নেয়ে-ধুয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনে সেই একটা আম দু-ভাগ ক'রে খেলেন। দুজনেরই মন খুঁৎ খুঁৎ

কর্‌তে লাগ্‌ল—তুটো আম খাবার কথা, একটা আম খেয়ে ফল পেলে হয় !

—২—

দশমাস দশদিন পরে বামুনের ঘরে সত্যিসত্যিই এক ছেলে হ'লো। দিব্যি-ফুটফুটে সোনার চাঁদ ছেলে !—কিন্তু, এ কি ! ছেলের বাঁ-দিকের শরীর কই ? ডান-দিকের হাত-পা-চোখ সবই আছে, কিন্তু বাঁ-দিকের কিছুই নেই !—মাথা হ'তে পা পর্য্যন্ত যেন করাত দিয়ে আধখানা পটলের মত চেরা ! ছেলে দেখে বাপ-মা তুজনেরই মনে হ'লো—'তুটো আমের বদলে একটা আম খাওয়ার ফল এই।' কিন্তু একে মা-ষষ্ঠীর দান, তার ওপর যা হওয়ার কথা ছিল না বুড়ো-বয়সে তাই হয়েচে,—বাপ-মা ভাব্‌লেন—'কাণা হোক্ খোঁড়া হোক্, ছেলে তো ! আর ছেলে বড় হ'লে হয় তো এ খুঁৎ থাক্‌বেও না।'

ছেলে কিন্তু বড় হ'য়েও যেমন আধ্‌লা তেম্‌নি আধ্‌লাই রইল। এক-পায়েই সে খুট্ খুট্ ক'রে হাঁটে, এক-হাত দিয়ে খায়-দায়, আর ঘাড় কাৎ ক'রে এক-চোখেই চায়।

পাড়ার লোকে তাকে দেখ্‌লেই হাসি-তামাসা করে। আর এক-ঠ্যাঙ্গে সে হাঁটে ব'লে তার নামও হ'লো—এক-ঠেঙ্গে বগা।

কিছুদিন বাদে বামুন-বামনী মারা গেলেন। তখন একলা পেয়ে এক-ঠেঙ্গে বগাকে নিয়ে পাড়ার লোকের মহাফূর্ত্তি! তাদের জ্বালায় তখন তার গাঁয়ে তেষ্ঠানোই দায় হ'লো।

শেষে লোকের হাসি-ঠাট্টায় জ্বালাতন হ'য়ে বামুনের ছেলে একদিন 'দুত্তোর' ব'লে দেশ ছেড়ে চল্‌ল।

—৩—

হেঁটে হেঁটে কতদূর গিয়ে বামুনের ছেলে দ্যাখে—নদীর ধারে এক শ্মশানতলায় কালো-মিস্‌মিসে এক ডাকিনী-বুড়ী। ডাকিনী-বুড়ীর হাতের পাতার চিহ্নও নেই, তার ওপর তার চোঁখের পাতা ঝুলে পড়েচে ঠোঁট পর্য্যন্ত।

পথে পায়ের শব্দ শুনে ডাকিনী-বুড়ী জিজ্ঞেস কর্‌ল—'কে যাও গা?'

বামুনের ছেলে বল্‌ল—'আমি বিদেশী।'

ডাকিনী-বুড়ী বল্‌ল—'দেশী হও বিদেশী হও, আমার একটা কাজ ক'রে দাও তো, বাছা! আমার চোখের পাতা-দুটো ঝুলে পড়েচে, দেখে-টেকে হাড়গোর চিবুতে পার্‌চিনে,—পাতা-দুটো ওপরে তুলে দিয়ে যাও।'

ডাকিনী-বুড়ীর কথা শুনে বামুনের ছেলে শ্মশানতলায় গেল। সেখানে এক সন্ন্যাসী আগুন জ্বেলে তপস্যা

কর্‌ছিলেন। বামুনের ছেলে সন্ন্যাসীর চিম্‌টেখানা নিয়ে এল। তারপর তা দিয়ে ডাকিনী-বুড়ীর চোখের পাতা ধ'রে

উপরদিকে টান দিতেই তা চট্ ক'রে উল্‌টিয়ে গেল; আর উল্‌টিয়েই তার মাথার ছু-দিকে ছুটো টুপীর মত এঁটে পড়্‌ল।

ডাকিনী-বুড়ী খুশী হ'য়ে বল্‌ল—'আঃ, বাঁচ্‌লুম! তুমি আমার এমন উপকার কর্‌লে, বাছা, তোমাকে আমি আর কি দেবো! নাও, এ নাচন-বাঁশীটা। এতদিন এটা আমিই বাজিয়েচি,—এখন বুড়ো-বয়সে ফোক্‌লা মুখে বাঁশীর স্থর আর জমে না। তুমিই এটা নিয়ে যাও। এই নাচন-বাঁশীর গুণ—এর উল্‌টো দিকে যতই ক'ষে ফুঁ দেবে, ততই এর স্থর শুনে লোকে নাচ্‌তে থাক্‌বে।'—এই ব'লে ডাকিনী-বুড়ী বামুনের ছেলেকে একটা বাঁশী দিল।

বামুনের ছেলে নাচন-বাঁশী নিয়ে যেমন হেঁটে আস্‌ছিল তেম্‌নি আবার হেঁটে চল্‌ল।

—৪—

হেঁটে হেঁটে খানিকদূর গিয়ে বামুনের ছেলে গ্যাখে—মাঠের পাশে মনসা-ঝোপের মাঝে কালো-মিস্‌মিসে এক নাগিনী-বুড়ী। নাগিনী-বুড়ীর পায়ের পাতার চিহ্নও নেই, তার ওপর তার নাকের ভেতর হ'তে লিক্ লিক্ ক'রে মাথা বের কর্‌চে দুটো সাপ!

পথে পায়ের শব্দ শুনে নাগিনী-বুড়ী বল্‌ল—'কে যাও গা?'

বামুনের ছেলে বল্‌ল—'আমি বিদেশী।'

নাগিনী-বুড়ী বল্‌ল—'দেশী হও আর বিদেশী হও,

আমার একটা কাজ ক'রে দাও তো, বাছা! একটু দুধ এনে এই সাপ-দুটোকে খাইয়ে দাও,—ঠাণ্ডা হ'য়ে এরা নাকের ভেতরে ঘুমিয়ে থাক্—নইলে সুড়সুড়িতে বাঁচি না।'

নাগিনী-বুড়ীর কথা শুনে বামুনের ছেলে মাঠের মধ্যে গিয়ে দ্যাখে—এক রাখাল গরু চরাচ্ছে। সে রাখালের কাছে চেয়ে খানিক দুধ নিয়ে এল। দুধ নাগিনী-বুড়ীর নাকের

কাছে ধর্‌তেই সাপ-দুটো চক্‌ চক্‌ ক'রে খেয়ে ফেল্‌ল; তারপর তারা সুড়্‌ সুড়্‌ ক'রে নাগিনী-বুড়ীর নাকের ভেতর গিয়ে লুকাল।

নাগিনী-বুড়ী খুশী হ'য়ে বল্‌ল—'আঃ, বাঁচ্‌লুম! তুমি আমার এমন উপকার কর্‌লে, বাছা, তোমাকে আমি আর কি দেবো! নাও, এ মোহন-আংটিটা। এতদিন এটা আমিই আঙ্গুলে পরেচি, এখন আর বুড়ো-বয়সে কুঁচ্‌কে আঙ্গুলে পর্‌তে পারি না। তুমিই এটা নিয়ে যাও। এই মোহন-আংটির গুণ—এটা উল্‌টো ক'রে আঙ্গুলে প'রে যাকে ছোঁবে তার আর নড়াচড়ার জো থাক্‌বে না।'—এই ব'লে নাগিনী-বুড়ী বামুনের ছেলেকে একটা আংটি দিল।

বামুনের ছেলে মোহন-আংটি নিয়ে যেমন হেঁটে আস্‌ছিল তেম্‌নি আবার হেঁটে চল্‌ল।

—৫—

হেঁটে হেঁটে হেঁটে কতদূর গিয়ে বামুনের ছেলে ছাখে—পথে বেজায় ভিড়, আর সেই ভিড় ঠেলে যে যে-দিকে পারে সাঁই সাঁই ক'রে ছুট্‌চে।

বামুনের ছেলে একে ওকে জিজ্ঞেস ক'রে জান্‌তে পার্‌ল—রাজার পাটহাতী ক্ষেপেচে; রাজবাড়ী হ'তে সে খবর

কে নিয়ে এসেচে, তাই শুনে পালাবার জন্যে লোকজনের এত ছুটাছুটি।

'পাটহাতী ক্ষেপেচে তো ক্ষেপেচে! তাকে ঠাণ্ডা কর্‌তে কতক্ষণ!'—এই-না ভেবে বামুনের ছেলে রাজবাড়ীর দিকে চল্‌ল। রাজবাড়ীর কাছাকাছি যেয়েই সে ছাখে রৈ রৈ কাণ্ড!—প্রকাণ্ড মেঘের মত হাতী—হন্যে হ'য়ে শুঁড় তুলে ছুটে আস্‌চে, আর তার পেছন পেছন শেকল নিয়ে ছুট্‌চে হাজার হাজার সেপাই-শান্ত্রী। রাজবাড়ীর তিন-পুরুষে পাটহাতী,—রাজার হুকুম—'হাতীর গায়ে যেন আঁচড় না লাগে, শেকলে বেঁধে পিলখানায় নিয়ে রাখ।'

বামুনের ছেলে ডান-হাতের আঙ্গুলে মোহন-আংটিটা উল্‌টো ক'রে প'রে পথের এক-পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যাই পাটহাতী শুঁড় উঁচিয়ে সেখানে এসেচে, অম্‌নি সে চট্‌ ক'রে তাকে ছুঁয়ে ফেল্‌ল। মোহন-আংটির ছোঁয়া লাগ্‌তেই দেখ্‌তে না-দেখ্‌তে পাগল হাতী ভেড়ার মত একদম ঠাণ্ডা! রাজবাড়ীর সেপাই-শান্ত্রী দেখে অবাক! আর পথের লোকজনেরাও দেখে থ' হ'য়ে গেল—একটা পুঁচ্‌কে-ছোঁড়ার এ কি কাণ্ড! তা-ও আবার তার অর্দ্ধেক শরীরই নেই!

রাজবাড়ীর সেপাই-শান্ত্রীরা তাড়াতাড়ি হাতীকে বেঁধে ফেল্‌ল। আর হাতীর সাথে বামুনের ছেলেকেও সঙ্গে ক'রে তারা রাজবাড়ীতে ফির্‌ল।

রাজা বামুনের ছেলেকে বাহবা দিতে দিতে বল্‌লেন—'আজ হ'তে আমার রাজসভায় তোমার স্থান হ'লো।'

—৬—

বামুনের ছেলে রাজসভায় আছে। এক-পায়ে জরির জুতো প'রে, এক-হাতে সোনায় বাঁধানো লাঠি নিয়ে, আর আধ্‌লা মাথায় মস্ত-বড় পাগ্‌ড়ী বেঁধে রোজ সে রাজসভায় যায়-আসে।

একদিন রাজসভায় গিয়ে বামুনের ছেলে শোনে—কোন্‌ বিদেশী-রাজ্যের রাজা এসে জয়ডঙ্কা দিয়েচেন—এ রাজ্যের রাজার সঙ্গে তিনি লড়াই করতে চান। বিদেশী-রাজ্যের রাজা নাকি মস্ত-বড় বীর। এ-রাজ্যের রাজা তো সে খবর শুনে কেঁপেই অস্থির।

বামুনের ছেলে রাজাকে বল্‌ল—'মহারাজ, আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আপনিও নয় এ-রাজ্যের জয়ডঙ্কায় জবাব দিতে বলুন—বিদেশী-রাজার শক্তি থাকে তো, আগে এসে আমার সঙ্গে লড়াই করুন।'

বামুনের ছেলের কথা শুনে সবাই ভাবে—'পুঁচ্‌কে ছোঁড়ার আস্পর্দ্ধা তো কম নয়!' কিন্তু তখনই তাদের মনে প'ড়ে গেল—অমন পাগ্‌লা হাতীকেই যে হাতে ধ'রে ঠাণ্ডা করেচে তার অসাধ্যই বা কি!

বামুনের ছেলের কথা-মত রাজা জয়ডঙ্কা দেওয়ার হুকুম দিলেন। ডঙ্কাও'লা বিদেশী-রাজাকে শুনিয়ে জয়ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে বল্‌তে লাগ্‌ল—'বিদেশী রাজার শক্তি থাকে তো আগে এসে রাজ্যের এক ছোক্‌রার সঙ্গে লড়াই করুন।'

জয়ডঙ্কা শুনে বিদেশী-রাজা চ'টেই লাল। তখনই সাজ্‌ সাজ্‌ শব্দে সাড়া প'ড়ে গেল। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বিদেশী-রাজা লড়াই কর্‌তে ছুটে এলেন।

বামুনের ছেলেও নাচন-বাঁশী হাতে ক'রে ছুটে গেল। বিদেশী-রাজার সৈন্যেরা তার সাম্‌না-সাম্‌নি হ'তেই সে উল্‌টো ক'রে বাঁশীটা ধ'রে পোঁ পোঁ ক'রে বাজাতে আরম্ভ কর্‌ল। দেখ্‌তে না-দেখ্‌তে বিদেশী-রাজার সৈন্য-সামন্ত হাতের ঢাল-তরোয়াল ফেলে সার বেঁধে তালে তালে নাচ্‌না সুরু কর্‌ল।

বিদেশী-রাজা সেনাপতিকে বল্‌লেন—'সেনাপতি, তুমি তরোয়াল নিয়ে এগোও। আমি একটু না নেচে থাক্‌তে পার্‌চি না।'

সেনাপতি বল্‌লেন—'মহারাজ, আমাকেও নাচের নেশায় ধরেচে। আমিও একটু নেচে নেই।'—ব'লেই সেনাপতি নাচন সুরু কর্‌লেন। তখন বিদেশী-রাজা আর তাঁর সেনাপতি একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ধিন্‌ ধিন্‌ ক'রে নাচ্‌তে লাগ্‌লেন।

এ-দিকে বামুনের ছেলের বাঁশী নানান্ সুরে পোঁ পোঁ ক'রে যতই বাজ্‌চে সবার নাচনও ততই জোরে চল্‌চে। লড়ায়ের মাঠে সৈন্য-সামন্তের সে কি নাচের ভঙ্গিমা!—মাথার ওপর হাত রেখে, ঘাড় দুলিয়ে, মাজা ঘুরিয়ে—এ ওর গা ঘেঁষে নাচ্‌চে তো নাচ্‌চেই।

নাচ্‌তে নাচ্‌তে সবার হাঁটু ফেটে যাচ্ছে, তবু বাঁশীর সুর থামে না, আর সে নাচনেরও ক্ষান্ত নেই!

বিদেশী-রাজা হাঁপাতে হাঁপাতে চ্যাঁচাতে লাগ্‌লেন—'ওগো ছোক্‌রা, একটু থামো,—আর যে পা চলে না।'

কিন্তু সে কথা শোনে কে? বামুনের ছেলের বাঁশী যেমন বাজ্‌ছিল তেম্‌নি বাজ্‌তেই লাগ্‌ল। আর এ-দিকে নাচনের চোটে দম বন্ধ হ'য়ে সকলের ওষ্ঠাগত প্রাণ!

শেষে আর সইতে না পেরে বিদেশী-রাজা বামুনের ছেলের কাছে এসে দড়াম্ ক'রে তার পায়ের গোড়ায় আছাড় খেয়ে পড়্লেন; সঙ্গে সঙ্গে গোঁ গোঁ ক'রে বল্তে লাগ্লেন—'দোহাই তোমার—থামো। তুমি কি চাও, বলো—এক্ষুণি আমি দিচ্ছি।'

বামুনের ছেলে বাঁশী থামিয়ে হেসে বল্ল—'কেন, মহারাজ, লড়ায়ের সাধ মিট্ল? আপনি এ-রাজ্য জয় কর্তে এসেছিলেন না? মাসখানেক পায়ের খেলাই চলুক্ আগে, তারপর নয় হাতের খেলা দেখাবেন।'

বিদেশী-রাজা বল্লেন—'আমার লড়ায়ের আর সাধ নেই। আমি নাকে খৎ দিচ্ছি—এখনই এ-রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি।'

বামুনের ছেলে বল্ল—'তা হ'লে তো ল্যাঠাই চুকে যায়। কিন্তু রাজার কথার জামিনও তো একটা চাই।'

বিদেশী-রাজা ব্যস্ত হ'য়ে বল্লেন—'আচ্ছা, সে জামিনও এই দিচ্ছি—আমার অর্দ্ধেক রাজত্ব ছেড়ে দিলুম।'

বিদেশী-রাজা তখনই তাঁর অর্দ্ধেক রাজত্ব লেখাপড়া ক'রে ছেড়ে দিলেন। আর নিজেও সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সে রাজ্য ছেড়ে পালালেন।

বামুনের ছেলে বিদেশী-রাজার লেখা জামিন নিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেল।

... ...

রাজা বিদেশী-রাজার জামিন দেখে বামুনের ছেলেকে বল্‌লেন—'এ অর্দ্ধেক রাজত্ব তুমিই জয় করেচ, তুমিই এর মালিক। এর ওপর আমার কাছেও কি চাও, বলো?'

বামুনের ছেলে বল্‌ল—'মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই না। আমার ওপর আপনার দয়ার তুলনা নেই। আমার নিজের শরীর যেমন অর্দ্ধেক, অর্দ্ধেক রাজত্বই আমার যথেষ্ট।'

... ...

এর পর এক-ঠেঙ্গে বগা বিদেশী-রাজ্যের অর্দ্ধেক রাজত্বের রাজা হ'য়ে রাজ-সিংহাসনে বস্‌ল।

তখন ভাটের মুখে রোজ সকাল-সন্ধ্যায় তার সেই এক-ঠ্যাং আর এক-হাতেরই প্রশংসা কত!

আষাঢ়ে গল্প

এক কাট্না-কাটা বুড়ী আর তার ছেলে চাঁদ। মায়ে-পোয়ে দুজনে থাকে আজবপুরে।

বুড়ী ঘরের দাওয়ায় ব'সে কাট্না কাটে; চাঁদ পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে লাট্টু খেলে। ঝড়-বাতাসে বুড়ীর হাতের তূলো কোথায় উড়ে যায়; খেল্‌তে খেল্‌তে চাঁদের হাতের লাটিম গড়িয়ে গিয়ে কোথায় পড়ে! বুড়ী ভাবে—'এই যাঃ! তূলোগুলো গড়্ গড়্ ক'রে কোথায় গড়িয়ে গেল!' চাঁদ

ভাবে—'দুত্তোর! লাটিমটা বুঝি সোঁ ক'রে উড়ে গেল!' আজবপুরের কাণ্ডকারখানাই আলাদা কিনা,—তাই সেখানে গড়িয়ে যাওয়াটাই হ'লো উড়ে-যাওয়া, উড়ে-যাওয়া হ'লো গড়িয়ে যাওয়া, আর সেই রকম সব ব্যাপারই সৃষ্টিছাড়া উল্টোপুল্টো!

কাট্‌না-কাটা বুড়ীর বোনের বাড়ী দুধ-সাগরের দেশে। সেখানে বারবছরে একবার মহোচ্ছবের ঘটা। দেশ-বিদেশের লোক সেই মহোচ্ছবে নেমন্তন্ন খেতে আসে। কাট্‌না-কাটা বুড়ীর ছেলে চাঁদ আজবপুরের সীমানায় দাঁড়িয়ে দিন গোণে —মাসীর দেশের মহোচ্ছবের দিন কবে আস্‌বে! সে সময়ে সে মাসীর বাড়ী যেতে পারে তো পেট পূরে মেঠাই-মণ্ডা খেয়ে আস্‌বে।

... ...

বারবছর বাদে মহোচ্ছবের দিন এল। খবর পেয়ে কাট্‌না-কাটা বুড়ীর ছেলে সেজেগুজে মাসীর বাড়ী চল্‌ল।

আজবপুর হ'তে দুধসাগর কম দূরে তো নয়। হেঁটে হেঁটে হেঁটে চাঁদের হাঁটুর বাঁধ ছিড়ে গেল, তবু মাসীর দেশের পথ ফুরায় কই? হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে শেষে যখন সে দুধসাগরের দেশে পৌঁছল তখন তার চক্ষুস্থির! কেমন দেশ এটা? এদেশে কি ডাইনে চাইলে বাঁ দিকে দৃষ্টি পড়ে নাকি? সাম্‌নে হাঁট্‌লে পিছিয়ে যেতে হয়? আবার চোখ চাইতে গেলে

ঘুরঘুট্টি আঁধারের মাঝে পথ-ঘাট গ্যাখে সাধ্যি কার ?···সাম্‌নে না তার মাসীর বাড়ী ? কিন্তু সাম্‌নের দিকে যতই সে এগোচ্ছে ততই যেন পা পিছ্‌লে পিছিয়ে যাচ্ছে !···'ব্যাপার কি !'—ব'লে চাঁদ মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়্‌ল।

ব'সে ব'সে ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার মনে হ'লো,—'এদেশে যখন সবই দেখ্‌চি উল্টো, তখন এক কাজ ক'রে দেখা যাক্‌ না,—চোখ বুজে আর পেছন ফিরে হেঁটে দেখি, হয় তো আঁধারের ধাঁধা থাক্‌বে না, আর সাম্‌নের দিকেও যাওয়া যাবে।' এই-না ভেবে সে চোখ বুজে আর পেছন ফিরে হাঁট্‌তে লাগ্‌ল। তখন সত্যিই তার চোখের সাম্‌নে দিব্যি খট্‌খটে দিনের আলো ফুটে উঠ্‌ল, আর সে এগোতেও লাগ্‌ল সাম্‌নে,—হুধসাগরের দিকে। এ-ভাবে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে রাত-দুপুরে সে মাসীর বাড়ী গিয়ে পৌঁছল।

এদিকে হুধসাগরের দেশের মহোচ্ছব ততক্ষণে শেষ হ'য়ে গ্যাছে। মাসী খাওয়া-দাওয়া সেরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল ; বোনপোর সাড়া পেয়ে জেগে উঠ্‌ল। কিন্তু রাত-দুপুরে বোনপোকে খেতে দেয় কি ?—ঘরে ছিল বাসি পান্তা-ভাত,, তাই এনে খেতে দিল। হেঁটে হেঁটে খিদেয় চাঁদের হুঁস-বোধ ছিল না—পান্তা-ভাত পেয়েই সে তাড়াতাড়ি এক খাবলা তুলে মুখে পূর্‌ল। কিন্তু হুধসাগরের দেশের 'পান্তা-ভাত মুখে রাখে তার সাধ্যি কি ?—ঠোঁটে

লাগ্‌তেই তার মনে হ'লো যেন তপ্ত আগুনের গোলা! গরমের চোটে—'ও মাঃ!'—ব'লে চাঁদ লাফিয়ে উঠ্‌ল। আর সেই এক-লাফেই সে উঠে পড়্‌ল দেড় হাজার হাত উপরে—

আকাশে। সেখানে গিয়ে এখনও সে মুখের জ্বালায় ছুটাছুটি ক'রে ফির্‌চে। আর মাসীর বাড়ীর পান্তা-ভাত খেয়ে তার জিভ-ঠোঁট-টাগ্‌রা পুড়ে যে দাগ হ'য়েচে, তাই দেখে লোকে বলে—ও চাঁদের কলঙ্ক!

গুরু
কাণ্ড

গদুর কাণ্ড

একটী ছেলে হ'লো যখন পাঁচটী মেয়ের পর,
আদর ক'রে রাখেন বাবা নামটী গদাধর।
ডাকেন দিদি—'যাদু আমার!' দাদা ডাকেন—'গদু!'
মা বলেন—'হও একটু বড়, সঙ্গী দেবো বধূ।'

বাড়্‌ল গদাধরের বয়স; বাড়্‌ল না যা বিদ্যে,—
বইয়ের আখর দেখ্‌লেই চোখ কয় ডেকে—'আয়, নিঁদ্ দে!'
বিদ্যে বরং মাথায় থাকুক্,—হস্তী এবং গাধা
দুইটীই কয় সমস্বরে—'এই আমাদের দাদা!'

বয়সে যখন গদাইচন্দ্র উঠ্‌ল নেহাৎ বেড়ে,
মায়ের দুঃখ,—'মাণিক আমার যায় বুঝি বা ছেড়ে!
বৌ-ছাড়া আর থাকবে কত খোকন-বাবা একা!'
গিন্নী খোঁচে—কর্ত্তার হ'লো বিয়ের কনে দেখা।

বিয়ের নামে গদাধরের ফূর্ত্তি—বেজায় ফূর্ত্তি !
আরশীতে রোজ একশোবারও ছ্যাখে নিজের মূর্ত্তি !

চ্যাঁচায় রোজই সন্ধ্যা-সকাল—টপ্পা-খেয়াল শেখে ।—
রজক ভাবে—'অই বুঝি মোর মরচে গাধা ডেকে !'

পাড়ার মোড়ল চৌদ্দআনীর চৌধুরীদের রাধা
বলেন এনে কান ধ'রে তার—'হচ্ছে কি ও, গাধা ?
বিয়ের নামে কার শুনেছিস্ চিল্লানিটা অত ?
কর্‌বি বিয়ে, মুখ বুজে থাক্ ভদ্রলোকের মত।'

ভদ্রলোকে কয় না কথা বিয়ের কালে বুঝি—
রাধুবাবুর কথায় গহু বুঝ্‌ল সোজাসুজি।
সেই হ'তে সে বোম্ ব'লে যে রাখ্‌ল চেপে ঠোঁট—
শালী-শালাজ ক'রেও তোয়াজ কেউ পেলে না ভোট।
পাঁচ-বছরের একটী শালা মার্‌ল কাতুকুতু—
নড়্‌ল না ঠোঁট, গালটী ফুলে উঠ্‌ল শুধু থুথু।

চৌধুরীদের কর্ত্তা বলেন—'এই বোকাটা, শোন্ তো !
বোবার মত শ্বশুর-বাড়ী রইলি চেপে দন্ত ?
ঠাট্টা-হাসি না-ই বা হ'লো, না-ই গোঁয়ালি রঙ্গে—
কইতে কথা হয় তো দুটো গুরুজনের সঙ্গে !'
কর্ত্তাবাবুর কথায় হ'লো অন্তরে আপশোষ,—
ভাব্‌ল গহু—'শুধ্‌রে নেবে যা-ই হয়েছে দোষ।'

শ্বশুর-বাড়ী গিয়েই ফিরে সাম্‌নে গহু দেখে—
গুড়ুক টেনে শ্বশুরটী তার জমাখরচ লেখে।
গুরুজনের সঙ্গে কথা কইতে তো হয় আগে—
কি কয় ?—ভেবে মনে যে, ছাই, কিচ্ছুই না জাগে !

অনেক ভেবে কয়—'করেছেন শ্বশুর-মশায় বিয়ে ?'
চোখ তুলে তার শ্বশুর ভাবে—'বল্‌চে জামাই কি এ ?...
হয় তো মাথা গরম হ'লো আস্‌তে হেঁটে রোদে !'
বলেন—'নেয়ে ঠাণ্ডা হবে, তেল দিয়ে যা, বোদে।'

দীঘির ঘাটে গদাই গিয়ে ফ্যাল্‌ফ্যালিয়ে চায়—
দীঘর মাটি কোথায় গেল !—খুঁজ্‌চে ডানে বাঁয়।
তক্ষুণি সে আস্‌ল ফিরে, বল্‌ল শ্বশুরটাকে,—
'দেখ্‌চি না তো দীঘির মাটি ! রাখ্‌ল কে কোন্‌ দিকে ?'
হেসে বলেন শ্বশুর—'বাপু, খোঁজ রাখ না কিছু !
দৃষ্টি তো[illegible]উচ্চে কিনা, তাই দেখ না নীচু !
খে[illegible] কিছু মাটি বেয়াই দিয়ে ছেলের বিয়ে,
বা[illegible]য়াছে আমার পেটে তোমায় মেয়ে দিয়ে !'

আক্কেল গুড়ুম

আক্কেল গুড়ুম

এক চাষা আর তার বৌ। দুজনে ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে।

চাষা-বৌ একহাতে ঘর-সংসারের কাজ সার্‌তে সার্‌তে দুপুর রাত হ'য়ে যায়। তারপর শুয়েই ঘুমে মরার মত বিছানায় সে প'ড়ে থাকে। পরের দিন ঘুম ভাঙ্গ্‌তে বেলা হ'য়ে যায়।

চাষা ভোরে উঠেই বৌকে ডাক্‌তে থাকে। তারপর চেঁচিয়ে-মেচিয়ে তার ঘুম ভেঙে দেয়।

চাষা-বৌ জেগে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বিছানার ওপর

ব'সেই ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—'বাবা রে বাবা! দু-দণ্ড যে চোখ বুজে থাক্‌ব তার জো নেই! রাত না-পোহাতেই ওঠো ওঠো ব'লে চ্যাঁচানি! চৌপদ্দিন দাসী-বাঁদীর মত খাট্‌ব, রাতেও একটু সোয়াস্তি নেই! মারি ঝ্যাঁটা পোড়া সংসারের মাথায়!'

চাষা বলে—'আহা, খাটুনি তো আর কারু নেই! সংসারের আর সবাই শুধু ব'সে ব'সে খায়, আর কুম্ভকন্নের মত নাক ডাকিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমোয়!'

চাষা-বৌ চটেমটে জবাব দেয়—'কি! আমার খাটুনির সঙ্গে অন্যের খাটুনির তুলনা! কর্‌তে হ'তো একদিনও এ-সংসারের কাজ, তা হ'লে চোখ উল্‌টে ভির্‌মি দিয়ে বিছানায় প'ড়ে থাক্‌তে হ'তো—সাত মাস!'

চাষা বলে—'ঘর-সংসারের কাজ আবার একটা কাজ নাকি! ঘস্ ঘস্ ক'রে দুখানা বাসন ডল্‌লুম, নয় তো, ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ ক'রে দুটো বড়া ভাজ্‌লুম!—ব্যস্, হ'য়ে গেল! করো না একদিন ক্ষেত-খামারের কাজ?—তা হ'লে দেখি হাড়ে ডুগ্‌ডুগি বাজ্‌বে!'

চাষা-বৌ বলে—'ঈ—স্—রে! টাগ্‌রায় জিভ্ ঠেকিয়ে টক্ টক্ শব্দ ক'রে গরু-মোষের ল্যাজ ম'লে দেওয়া—মদ্দানিটা কত!...বেশ তো, রোজই তো বল্‌চি, 'কাজটা বদল ক'রে একবার দেখাই হোক্ না!'

ঝগড়ায় ঝগড়ায় ঠিক হ'লো—পরের দিন চাষা-বৌ কর্‌বে ক্ষেতের কাজ, আর চাষা থাক্‌বে বাড়ীতে—ঘর-সংসারের কাজ কর্‌তে।

রাত পোহালে ঘুম থেকে উঠে চাষা-বৌ সত্যিসত্যিই লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে ক্ষেতে চল্‌ল। চাষাও বিছানা ছেড়ে উঠে ঘর-সংসারের কাজে লেগে গেল।

... ...

চাষার ছিল ইয়া-লম্বা-শিং-ও'লা ছুটো মোষ। তাদের লাঙ্গলে জুড়ে চাষা ক্ষেত চষে। চাষা-বৌ লাঙ্গল কাঁধে ক'রে মোষ-ছুটোর দড়ি ধ'রে নিয়ে চল্‌ল।

বাড়ী ছেড়েই একটা পানাভরা ডোবা,—যেমন তাতে পচা জল তেম্‌নি বেজায় কাদা। চাষা রোজ সেই জলকাদা ভেঙ্গে—হেই হেই ক'রে মোষ তাড়িয়ে—ডোবা পার ক'রে নেয়। ডোবার কাছে এসে চাষা-বৌ ভাব্‌ল—'মিছে আর জলকাদাটা ভাঙ্গি কেন!—মোষের পিঠে চ'ড়েই ও-পারে যাওয়া যাক্‌।'—এই-না ভেবে সে একটা মোষের পিঠে চ'ড়ে আর-একটার দড়ি ধ'রে ডোবায় নাম্‌ল। কিন্তু জলকাদা ভেঙ্গে ডোবার মাঝখানে গিয়ে মোষ-দুটো আর নড়্‌তে চায় না। চাষা-বৌ চাষার মত হেই হেই ক'রে যতই তাদের খোঁচায়, ততই তারা কাদার মধ্যে লট্‌কে পড়্‌তে চায়। শেষে জলের উপর নাক তুলে ভোঁস্‌ ভোঁস্‌ ক'রে ছু-চারবার

চাষা-বৌও গলা-সমান জলে ডুবে গেল—৬১ পৃষ্ঠা

শোয়াস ছেড়ে সত্যিই তারা কাদার মধ্যে লট্‌কে পড়্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে চাষা-বৌও গলা-সমান জলে ডুবে গেল। কাঁধে লাঙ্গল, এক হাতে পাচন-বাড়ি, আর-এক হাতে মোষের দড়ি, তার ওপর গলা-সমান পচা ডোবার কালো-কাসুন্দি জল— চাষা-বৌ না পারে মোষের পিঠ থেকে নাম্‌তে, না পারে মোষ তাড়িয়ে পারে উঠ্‌তে!—ডোবার মধ্যে তখন সে নাকালের একশেষ!

এদিকে চাষা উনুনে আগুন দিয়ে ভাতের হাঁড়ির সরাটা আল্‌গা ক'রে নীচে রেখেচে, এমন সময় তার মনে পড়্‌ল— 'এই যাঃ! হাঁসগুলোকে তো খোঁয়াড় হ'তে ছেড়ে দেওয়া হয়নি!' চাষা ভাতের হাঁড়ি পৈঁঠার ওপরেই রেখে তাড়াতাড়ি হাঁসের খোঁয়াড়ের কাছে ছুটে গেল। এর মধ্যে কোত্থেকে এক বেরাল এসে একলাফে সেই ভাতের হাঁড়ির কাছে গিয়ে হাজির। হাঁড়ির মধ্যে ছিল পান্তা-ভাত আর এক-বাটী বাসি মাছের ঝোল। বেরাল ভোজের জিনিস পেয়ে হাঁড়ির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে চুক্‌ চুক্‌ ক'রে খেতে লাগ্‌ল। খোঁয়াড় হ'তে হাঁস ছেড়ে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে ফিরে আস্‌তে বেরালের কাণ্ড দেখে চাষার চক্ষুস্থির! সে তাড়াতাড়ি হেঁসেলের দিকে ছুটে গেল। বেরালও মানুষের

পায়ের শব্দ শুনে তক্ষুণি দরজা দিয়ে দে-ছুট্! আর পালাবার সময় তার পায়ে লেগে ভাতের হাঁড়িও উল্টে নীচে প'ড়ে চুরমার!

চাষার আর হুঁসবোধ রইল না—রাগের চোটে উনুনের মধ্য হইতে জ্বলন্ত একখানা চেলাকাঠ নিয়ে সে বেরালের দিকে ছুঁড়ে মার্‌ল। কিন্তু বেরাল তখন কোথায়?—জ্বলন্ত কাঠ পড়্‌ল গিয়ে রান্নাঘরেই পাশে খড়ের গাদার ওপর। শুক্‌নো খড় কাঠের আগুনে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ল। তারপর দেখ্‌তে না-দেখ্‌তে খড়ের আগুনে রান্নাঘরের চালও ধ্ব'সে গেল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চাষা কাঠের পুতুলের মত রান্নাঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল।

... ...

চাষার বাড়ী আগুন দেখে পড়্‌শীরা সব ছুটে এল। ডোবার পার দিয়ে আস্‌তে তারা ত্থাখে—চাষা-বৌ জলে ভাস্‌চে! তখন তারা ডোবার জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাকে তুল্‌তে গিয়ে ত্থাখে—কাঁধে লাঙ্গল নিয়ে সে মোষের পিঠে চ'ড়ে আছে। লোকজনেরা মোষ তাড়িয়ে চাষা-বৌকে পারে তুলে আন্‌ল।

এদিকে চাষার বাড়ীতে যারা ছুটে গিয়েচে, তারা ত্থাখে চাষা কাঠের পুতুলের মত ঠায় রান্নাঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে

হঠাৎ...চেলাকাঠ...বেয়ারাদের দিকে ছুঁড়ে মারল—৬২ পৃষ্ঠা

আছে, আর তার মাথার ওপর রান্নাঘরের চাল জ্বল্‌চে! লোকজনেরা চাষাকে রান্নাঘর থেকে টেনে বার কর্‌ল। তারপর সকলে হৈ চৈ ক'রে জল্ এনে আগুন নিভিয়ে দিল।

সেদিন চাষার ঘরে উনুনও জ্বল্‌ল না, আর তার ক্ষেতে লাঙ্গলও পড়্‌ল না।

... ...

পাড়া-পড়্‌শীরা চ'লে যেতে চাষা তার বৌকে বল্‌ল—'একদিনেই আক্কেল গুড়ুম! এখন হ'তে যত-খুশী তুমি ঘুমিয়ো। আর কখ্‌খনো ডেকে তোমার ঘুম ভাঙ্গি তো হাজার কান-মলা খাই।'—ব'লে সত্যিই সে দু-হাতে নিজের দু-কান মল্‌তে লাগ্‌ল।

চাষা-বৌ বল্‌ল—'আর তোমার ডাকার অপিক্ষেয় থাক্‌লে তো! কাক-ডাকার আগেই বিছানা ছেড়ে না উঠি তো—আমার পিঠে মেরো সাত ঝ্যাঁটা!'

বোক-চাঁদের
হাট

বোক-চাঁদের হাট

এক সদাগর।

সদাগরের লক্ষ্মীর সংসার; কিন্তু স্ত্রীটী আকাট বোকা; আর তাদের ছেলেপুলেও নেই।

সদাগর-বৌ এক-একদিন সদাগরের কাছে আব্‌দার ক'রে বলে—'ওগো, একটা হীরেমন-পাখী এনে দাও না!'

সদাগর বলে—'কেন?'

'কেন আবার কি! যদি আমাদের একটী ছেলে হয়, তার খেলার জন্যে লাগ্‌বে না!'

স্ত্রীর কথা শুনে সদাগরের হাসিও পায় রাগও হয়। কোথায় তাদের ছেলেপুলে তার উদ্দেশ নেই, তারই জন্যে

সদাগর-বৌ…আব্‌দার ক'রে বলে—'ওগো, একটা হীরেমন-পাখী এনে দাও না !'—৬৭ পৃষ্ঠা

চাই কিনা একটা হীরেমন-পাখী! শেষে সদাগর বরাতের

দোষ দিয়ে ভাবে—এমন স্ত্রীও কপালে জুটেচে!—যেমন তার বুদ্ধি তেম্‌নি কথা!

সদাগরের মুখে সাত-সমুদ্দুর তের-নদীর গল্প শুনে, সদাগর-বৌ সুধোয়—'হ্যাগা, ক্ষীর-সমুদ্দুর একটা আছে না?'

সদাগর বলে—'আছে বই কি!'

'তোমাকে ক্ষীর-সমুদ্দুরও পাড়ি দিয়ে বাণিজ্য কর্‌তে যেতে হয়?'

'হয়ই তো।'

সদাগর-বৌ বলে—'তবে একটা কাজ ক'রো না! এবার যখন যাবে, ক্ষীর-সমুদ্দুরের পার হ'তে কয়েকটা ভালো গাই নিয়ে এস। সেখানের গাইয়ের দুধ হয় তো ক্ষীরেরই মত। যদি আমাদের একটী ছেলে হয়, সেই গাইয়ের দুধ খাবে।'

সদাগর মুখ বেঁকিয়ে স্ত্রীকে ধম্‌কে ওঠে; বলে—'তোমার বোকামী-কথা শুনে ঘর-সংসার ছেড়ে বনে চ'লে যেতে ইচ্ছে হয়।'

সদাগর-বৌ নিজে বোঝে না কোন্‌ কথাটায় তার বোকামী হ'লো। সে দুঃখ করতে থাকে—এমন কপাল তার! স্বামীর কাছে একটা মনের কথা বলারও জো নেই!

স্ত্রীর প্যানপ্যানানি সদাগরের ভালো লাগে না। যখন বাড়াবাড়ি ছ্যাখে তখন সে চটেমটে—'ছুত্তোর'—ব'লে সদরে গিয়ে ব'সে থাকে, নয় তো, ডিঙ্গা সাজিয়ে বাণিজ্য কর্‌তে বিদেশে চ'লে যায়।

এই রকম প্রায়ই হয়। আর এতে সদাগরের মনেও শান্তি নেই, সদাগর-বৌর মনেও সুখ নেই।

একদিন ভোরবেলা উঠে উঠানে পা দিয়েই সদাগর-বৌ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'ওগো, শীগ্‌গির ওঠ, ছ্যাখো এসে কি সব্বনেশে কাণ্ড!'

সদাগর জেগে উঠে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে জিজ্ঞেস কর্‌ল—'কি হয়েচে?'

সদাগর-বৌ দেখিয়ে দিল রাত্রের ঝড়ে প্রকাণ্ড এক গাছ ভেঙ্গে সদর-দরজার গোড়ায় পড়েচে। সে বল্‌ল—'ওগো, আমাদের যদি একটী ছেলে থাক্‌ত, আর সে খেলা ক'রে বাড়ী আসার সময় যদি এই গাছটা ভেঙ্গে তার মাথায় পড়্‌ত তো বাছার আমার রক্ষা ছিল না! তা হ'লে কি সব্বনাশই হ'তো গো, কি সব্বনাশই হ'তো!'—সর্ব্বনাশের কথা মনে ক'রে সদাগর-বৌ কেঁদেকেটে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিল।

ভোরে উঠেই এই সব আজগুবী কথা শুনে সদাগর চ'টে লাল! তার ওপর আবার যা-নেই তার জন্যে

এ কি মায়া-কান্না!—সদাগর ঘরের বাইরে এসে বল্‌ল—'তোমার মত বোকা নিয়ে ঘর-সংসার মানুষে কর্‌তে পারে না। তোমার ছেলে হ'লে কোন্ খেল্‌না চাই, সে কোন্ নন্দিনী-গাইয়ের ক্ষীর খাবে, আর ছেলে থাক্‌লেই বা আজ কোন্ সব্বনেশে কাণ্ড হ'তো, সে-সব আজগুবী ভাব্‌না নিয়ে তুমি যত-খুশী একলা-একলা ব'কে মর। আমি ও-সব কানে শুন্‌তে পারিনে,—আমি বাণিজ্য কর্‌তে বিদেশে চল্‌লুম।'

সদাগর বাণিজ্যের ডিঙ্গা সাজিয়ে সত্যিসত্যিই বিদেশে চল্‌ল।

... ...

সাত-সমুদ্দুর তের-নদী পেরিয়ে সদাগরের ডিঙ্গা চলেচে। যেতে যেতে এক রাজার রাজ্য ছাড়িয়ে সদাগর আর-এক রাজার রাজ্যে উপস্থিত হ'লো। সেখানে ডিঙ্গা পারে লাগ্‌তেই সে চেয়ে ছাখে—একজন লোককে কাঁধে ক'রে একদল-কারা ছুটেচে; আর যে-লোকটাকে কাঁধে ক'রে ছুটেচে সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চারদিকে তাকাচ্ছে।

সদাগর পারে উঠে পথের একজন লোককে জিজ্ঞেস করল—'ব্যাপার কি হে? এ লোকটাকে কাঁধে ক'রে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?'

পথিক বল্‌ল—‘ও-লোকটা মরেচে কিনা, তাই শ্মশানে পোড়াতে নিয়ে যাচ্ছে।’

সদাগর বল্‌ল—‘সে কি! লোকটা দেখ্‌লুম ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক’রে তাকাচ্ছে। সে আবার মরেচে কি!’

পথিক বল্‌ল—‘তুমি কোথাকার বেল্লিক হে? মরা মানুষকে বল্‌তে চাও মরেনি! আর যে গাছের কাটা-ডাল-শুদ্ধ হুড়মুড় ক’রে নীচে প’ড়ে গেল—সবাই দেখেচে,—সে মরেনি তো, মর্‌বে কে!’—এই-না ব’লে পথিক সদাগরের দিকে কট্‌মট্‌ ক’রে তাকিয়ে চ’লে গেল।

সদাগর একে-ওকে জিজ্ঞেস ক'রে জান্‌ল—লোকটী একটা গাছের ডালের মাথায় ব'সে সেই ডালেরই গোড়া কাট্‌ছিল। তখনই নাকি কে তাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিল—'বাপু, গোড়ার ডাল কাট্‌চ আগডালে ব'সে—ডাল কাটা হ'য়ে গেলে হুড়মুড় ক'রে যখন নীচে প'ড়ে যাবে তখন টেরটী পাবে! অতদূর থেকে ধপাস্ ক'রে নীচে পড়্‌তো সঙ্গে সঙ্গে নিঘ্‌ঘাৎ মরণ।' ব্যাপারও হয়েচে তাই। ডালখানিও কাটা হ'লো, আর লোকটীও কাটা-ডালশুদ্ধ মাটিতে প'ড়ে গেল। আগেই তাকে যা বলা হয়েছিল ফল্‌লও কিনা তাই, লোকটী তাই দেখেশুনে নিজেও ভাব্‌চে—সত্যিই সে ম'রে গ্যাছে।

একটা জ্যান্ত মানুষকে মরা ভেবে পোড়াতে নেয়, আর যাকে পোড়াতে নিচ্ছে সে-ও ভাবে সে মরেচে, এমন বোকার দলও জগতে থাকে!—ভাব্‌তে ভাব্‌তে সদাগর ছুটে শ্মশানে গিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে বল্‌ল—'গাছ থেকে পড়্‌লেই লোক মরে না। এ লোকটীও মরেনি।'

লোকজনেরা বল্‌ল—'বাঃ! বল্‌লেই হ'লো মরেনি! ভালো, মরেনি তো, ও হাসে না কেন? জ্যান্ত মানুষ তো হাস্‌তে পারে, হাস্থক্ দেখি ও একবার!'

সদাগর লোকটাকে কাতুকুতু দিতেই সে খিল্‌খিল্ ক'রে

হেসে উঠ্‌ল। তখন সত্যিই সবাই বুঝ্‌ল—সে মরেনি। তারপর তাকে নিয়ে সবাই ঘরে ফিরে গেল।

সদাগর ডিঙ্গায় ফিরে এসে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—এ তো আচ্ছা বোকার দেশ হে!

... ...

সাত-সমুদ্দুর তের-নদী পেরিয়ে সদাগরের ডিঙ্গা আবার চলেচে। যেতে যেতে এক রাজার রাজ্য ছাড়িয়ে সদাগর আর-এক রাজার রাজ্যে উপস্থিত হ'লো। সেখানে নদীর পারে ডিঙ্গা লাগ্‌তেই সে চেয়ে ছাখে—চারদিকে ভারী সোরগোল। নদীর জলে ভুস্‌ ভুস্‌ ক'রে একদল লোক ডুবুচ্ছে, আর-একদলের কেউ আঁক্‌শী দিয়ে কেউ বা জাল ফেলে নদীর জল তোলপাড় ক'রে তুলেচে।

ডিঙ্গা থেকে নেমে সদাগর পথের একজন লোককে জিজ্ঞেস করল—'ব্যাপার কি হে?'

পথিক বল্‌ল—'তুমি কোথাকার লোক হে? দেখ্‌চ না, নদীর মধ্যে চাঁদটা প'ড়ে গ্যাছে! সবাই তাকে জল থেকে তোলার চেষ্টা কর্‌চে। নইলে, চাঁদ নদীতে ডুবে গেলে, রাতে জ্যোছ্‌না উঠ্‌বে কোত্থেকে!'

পথিকের কথা শুনে সদাগর হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠ্‌ল। তারপর তার ঘাড়টাকে ধ'রে মুখখানি ঠেলে আকাশের দিকে তুলে দেখিয়ে দিল—'ছাখো তো, ওটা কি?

আকাশের চাঁদ নদীতে প'ড়ে যায় শুনেচ কোথা? নদীর জলে যা দেখ্‌চ—ও তো চাঁদের ছায়া।'

সদাগরের কথায় পথিকের চমক ভাঙ্‌ল। সে লোক-জনকে ডেকে আকাশের চাঁদটী দেখিয়ে দিল। তখন জলের লোক পারে উঠ্‌ল; আর পারের লোকের সঙ্গে মিলে যে-যার বাড়ী চ'লে গেল।

ডিঙ্গায় ফিরে গিয়ে সদাগর ভাব্‌তে লাগ্‌ল—এ-ও তো এক আচ্ছা বোকার দেশ হে!

... ...

সাত-সমুদ্দুর তের-নদী পেরিয়ে সদাগরের ডিঙ্গা আবার চলেচে। যেতে যেতে এক রাজার রাজ্য ছাড়িয়ে সদাগর আর-এক রাজার রাজ্যে উপস্থিত হ'লো। সেখানে নদীর পারে ডিঙ্গা থামিয়ে সে রাজ্যের ভেতর হেঁটে চল্‌ল।

হেঁটে হেঁটে কিছুদূর গিয়ে সদাগর দ্যাখে—একটা বাড়ীর সাম্‌নে বেজায় ভিড়। সেই ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে টোপর-মাথায় এক বিয়ের বর; আর তার পাশে করাত-হাতে এক ছুতোর-মিস্ত্রী। বরকে ধ'রে একদল লোক টান্‌চে আর বল্‌চে—'এর পা-দুটোকেই কাট, মিস্তিরী।' আর-একদল বল্‌চে—'না রে না, পা কাট্‌লে হাঁট্‌বে কি ক'রে! তার চেয়ে মাথাটাকেই কেটে ফেল।'

ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে সদাগর পথের একজন লোককে জিজ্ঞেস কর্‌ল—'ব্যাপার কি হে?'

পথিক বল্‌ল—'কে হে তুমি? দেখ্‌চ না, এটা বিয়ের বাড়ী! বর এসেচে বিয়ে কর্‌তে। কিন্তু কনের বাড়ীর

বরকে ধ'রে...টানচে—৭৫ পৃষ্ঠা।

দরজাটা বড় ছোট কিনা, তা দিয়ে বর যায় কি ক'রে? তাই ওর পা বা মাথাটা কেটে খাটোসাটো ক'রে ভেতরে নেওয়ার পরামর্শ হচ্ছে।'

পথিকের কথা শুনে সদাগর হোঃ হোঃ ক'রে হেসে

উঠ্‌ল। তারপর সে বল্‌ল—'বল্‌চ কি হে? পা বা মাথা কাট্‌লে লোক বাঁচে নাকি!'

পথিক বল্‌ল—'কিন্তু উপায় কি?'

সদাগর বল্‌ল—'উপায় তো এর সোজা। দাঁড়াও, আমি উপায় ক'রে দিচ্ছি।'—এই-না ব'লে সে বরের কাছে গিয়ে তার হাত ধ'রে কনের বাড়ীর দরজার কাছে নিয়ে গেল। তারপর তাকে কুঁজোর মত ক'রে নুইয়ে ধ'রে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিল।

লোকজনেরা তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল; আর বরের দেখাদেখি নিজেরাও কুঁজোর মত হ'য়ে নুইয়ে নুইয়ে বিয়ের বাড়ী ঢুক্‌ল।

ডিঙ্গায় ফিরে গিয়ে সদাগর ভাব্‌তে লাগ্‌ল—এ-ও তো আর-এক আচ্ছা বোকার দেশ হে!

সাত-সমুদ্দুর তের-নদী পেরিয়ে সদাগরের ডিঙ্গা আবার চলেচে। যেতে যেতে এক রাজার রাজ্য ছাড়িয়ে সদাগর আর-এক রাজার রাজ্যে উপস্থিত হ'লো। সেখানে নদীর পারে ডিঙ্গা থামিয়ে সে রাজ্যের ভেতর বেড়াতে বেরুলো।

হেঁটে হেঁটে এক তে-পথের মাথায় গিয়ে সদাগর ছাখে

—জন-পাঁচেক বুড়ো রাস্তার পাশে জড়ো হ'য়ে ব'সে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদ্‌চে।

সদাগর বুড়োদের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌ল—'ব্যাপার কি হে?'

বুড়োরা বল্‌ল—'আমরা পাঁচজনে এই পথ দিয়ে যেতে যেতে পথের পাশে জিরুতে বসেছিলুম। একসঙ্গে এতক্ষণ ব'সে থেকে আমাদের পায়ের পাতা হারিয়ে গ্যাছে। কার কোন্ পা এখন আর ঠিক কর্‌তে পার্‌চিনে। তাই ওঠারও সাধ্যি নেই।'

বুড়োদের কথা শুনে সদাগর হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠ্‌ল। তারপর তাদের বল্‌ল—'আচ্ছা, তোমাদের কার কোন্ পা এক্ষুণি আমি চিনিয়ে দিচ্ছি। তোমরা একটু চোখ বুজে বস দেখি।'

সদাগরের কথায় পাঁচ-বুড়ো চোখ বুজে রইল। সদাগর তখন হাতের লাঠিখানা দিয়ে দমাদ্দম ক'রে পাঁচ-বুড়োর পিঠে পাঁচ-পাঁচ ঘা বসিয়ে দিল। আচম্‌কা পিটুনি খেয়ে বুড়োদের সকল ধান্ধা ঘুচে গেল। তখন তারা যে যে-দিকে পারে লম্বা লম্বা পা ফেলে দে-ছুট্!

... ...

ডিঙ্গায় ফিরে গিয়ে সদাগর ভাব্‌তে লাগ্‌ল—সব দেশেই দেখ্‌চি বোক-চাঁদের হাট! আমিই মিছে দুঃখ ক'রে মরি

কেন! সদাগর-বৌ বোকা হ'লেও মেয়েছেলে, আর এরা যে সব পুরুষ-বোকার দল!

সদাগর মাঝিদের বল্‌ল—'আর বিদেশে ঘুরে দরকার নেই। এখন ডিঙ্গা ফিরাও।'

পাঁচ-বুড়োর পিঠে পাঁচ-পাঁচ ঘা বসিয়ে দিল—৭৮ প

তারপর সাতসমুদ্দুর তের-নদী পেরিয়ে সদাগরের ডিঙ্গা বাড়ী ফিরে গেল।

... ...

এরপর সদাগর-বৌ যখনই আবার হীরেমন-পাখীর কথা বলে, তখন সদাগর জবাব দেয়—'আচ্ছা, বলো তো,

কি রঙের হীরেমন-পাখী চাও?—রাঙা-টুক্‌টুকে, না, হল্‌দে?'

আবার ক্ষীর-সাগরের পারের গাইয়ের কথা শুন্‌লেও সদাগরের আর রাগ হয় না। সে হেসে হেসে সদাগর-বৌকে জবাব দেয়—'পাগ্‌লী, ক্ষীর-সাগর যে অনেক দূরে! সেখানে যেতে হ'লে কিন্তু অনেক দিন বাড়ী ছেড়ে থাক্‌তে হবে।··· রাজী তো?'

সদাগর-বৌ তখন জবাব দেয়—'থাক্, কাজ নেই তবে আর সেখানে গিয়ে।'

ধর্ম্মের
কল

ধর্ম্মের কল

কাশীর রাজা আর কোশলের রাজা। দু-রাজার মধ্যে লড়াই লেগেই আছে। কোশলের রাজা বারবারই লড়াই কর্‌তে কাশীর রাজার রাজ্যে আসেন, আর বারবারই হেরে যান। তবু তাঁর লড়ায়ের সাধ মেটে না। তাই কাটাকাটি মারামারিরও অন্ত নেই, সাত-পুরুষ ধ'রে লড়ায়েরও শেষ হয় না।

সাত-পুরুষ বাদে কাশীর রাজা হ'লেন ধর্ম্মদত্ত, আর কোশলের রাজা হ'লেন উগ্রধর। ধর্ম্মদত্ত ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়েই কাটান। উগ্রধর যুদ্ধের নামেই মেতে আছেন।

উগ্রধর সিংহাসনে ব'সেই হুকুম দিলেন—'সাত লক্ষ সৈন্য চাই। সেই সৈন্য নিয়ে হুড়মুড় ক'রে কাশীতে গিয়ে এমন ভাবে পড়্‌তে হবে যেন কাশীর রাজার পালাবার পথ না থাকে।'

রাজার হুকুম পেয়ে কোশলের সেনাপতি সাত লাখ সৈন্য সাজিয়ে আন্‌লেন। উগ্রধর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কাশীর রাজার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে চল্‌লেন।

সাত লাখ সৈন্য হৈ-হৈ রৈ-রৈ ক'রে কাশীরাজ্যের সীমানায় উপস্থিত হ'লো। যুদ্ধের ডঙ্কা বেজে উঠ্‌ল—দম্ দম্ দম্! কিন্তু সে শব্দ শুনেও কাশীরাজ্যে কারো সাড়া-শব্দ নেই!—সারা রাজ্য যেন ঘুমে নিঝুম! উগ্রধর মন্ত্রীকে ডেকে বল্‌লেন—'মন্ত্রী, ব্যাপার কি?'

মন্ত্রী বল্‌লেন—'তাই তো, মহারাজ! যুদ্ধের ডঙ্কা শুনেও চুপ ক'রে ব'সে থাকে এমন লোক তো কোথাও দেখিনি। চর পাঠিয়ে জানা যাক্—ব্যাপার কি!'

রাজা বল্‌লেন—'বেশ, তাই ভালো।'

কোশলের রাজার হুকুমে তাঁর চর ভিখারী সেজে কাশী-রাজ্যের ভেতর ঢুক্‌ল। সাম্‌নেই রাজার রাজপুরী। সে-রাজপুরীর সিংহদ্বারে না আছে সেপাই, না আছে শান্ত্রী,—রাজ্যের লোক ইচ্ছামত রাজপুরীতে যায়-আসে। চর অবাক্ হ'য়ে লোকজনের সঙ্গে সঙ্গে রাজপুরীতে ঢুক্‌ল।

রাজপুরীর ভেতরে গিয়ে সে ছাখে—আরো অবাক্-কাণ্ড! কোথায় বা রাজা, আর কোথায় বা রাজ-দরবার! যার যেমন-খুশী চলে-ফেরে,—না আছে একটা নালিশ-ফরেদ, না আছে সেপাই-শান্ত্রীর হুম্‌কি! শুধু রাজবাড়ীর উঠানে পাতা

একখানা রাজ-সিংহাসন, আর সেই সিংহাসনের সাম্‌নে মাটিতে ব'সে এক সন্ন্যাসী! ভোর হ'তে না-হ'তে রাজ্যের লোক সিংহাসনের চারপাশে এসে জড়ো হয়, আর এক-

একটা বেলপাতায় কি লিখে সন্ন্যাসীর হাতে দেয়। সন্ন্যাসী বম্‌ বম্‌ ক'রে গাল বাজিয়ে বেলপাতা সিংহাসনে ছুঁইয়ে ফেরত দেন। তাতেই নাকি যার যা চাই তাই মেলে।

এ সব দেখে-শুনে চর কোশলের রাজার কাছে ফিরে গেল। সকল কথা শুনে কোশলের রাজা বল্‌লেন—'ভালোই হ'লো। রাজারই যখন উদ্দেশ নেই, তখন রাজ্‌-সিংহাসনখানিকেই দখল করা যাক্‌। আর এদেশের লোকের যখন বেলপাতার ওপর এত বিশ্বাস, তখন বেলগাছগুলোকেও কেটে সাবাড় করা যাক্‌। দেখা যাক্‌, সিংহাসন আর বেলপাতা বিনে কাশীরাজ্য ক'দিন টেকে!'

সবাই—'বেশ, বেশ'—ব'লে রাজার কথায় সায় দিল।

তখনই কোশলের রাজার সাত লাখ সৈন্য তরোয়াল ফেলে কুড়ুল হাতে নিয়ে বেলগাছ কাট্‌তে ছুট্‌ল; আর সেনাপতি নিজে চল্‌লেন রাজ-সিংহাসনখানি দখল কর্‌তে।

কাশীর রাজার রাজ-সিংহাসনখানি দখল ক'রে সঙ্গে নিয়ে কোশলের রাজা কোশলরাজ্যে ফিরে গেলেন।

রাজ্যে পৌঁছে কোশলের রাজা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দিতে বল্‌লেন—রাজপুরীতে তাঁর দিগ্বিজয়ের উৎসব হবে। তখন তিনি সাত-পুরুষের অপমানের শোধ তুল্‌বেন—কাশীর রাজার রাজ-সিংহাসনখানি হবে কোশলের রাজার পা-দানি।

... ...

উৎসবের দিন রাজ্যের লোক এসে রাজবাড়ীতে ভেঙ্গে পড়্‌ল। রাজা দরবারের পোষাক প'রে রাজসভায় দেখা দিলেন। আটটা হাতী হিড়্‌ হিড়্‌ ক'রে কাশীর রাজার

রাজ-সিংহাসনখানিকে টেনে আন্‌ল। কোশলের রাজা জরির-জুতো-পরা পা-দুখানি তুলে দিলেন কাশীর রাজার সিংহাসনের ওপর।

সিংহাসনের ওপর যাই-না রাজার পা ছুঁয়েছে, অম্‌নি ফট্‌ ক'রে কিসের আওয়াজ হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে রাজার পায়ের জরির জুতো-দুখানি ছিট্‌কে গিয়ে পড়্‌ল রাজসভার মাঝখানে; আর রাজার পায়ের পাতা-দুখানি ফুল্‌তে ফুল্‌তে ফুলে উঠ্‌ল—যেন দুটো সাঁতরাগাছির ওল!

তারপর পা তুল্‌তে গিয়ে রাজার পা আর নড়ে না—এক-এক-মণী গোদের ভারে দু-পায়েরই হাঁটু পর্য্যন্ত টন্‌টন্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। তখন তিনি না পারেন উঠ্‌তে, না পারেন ব'সে থাক্‌তে।—'কি হ'লো!'—ব'লে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে মন্ত্রীর দিকে শুধু তাকাতে লাগ্‌লেন।

মন্ত্রীর হুকুমে তক্ষুণি হাকীম এল, রোজা এল; আর চারদিকে ঢ্যাঁড়া পিটিয়েও দেওয়া হ'লো—রাজার পায়ের গোদ যে সারাতে পার্‌বে তার যা চাই তাই বক্‌শিশ মিল্‌বে।

ঢ্যাঁড়া শুনে এক সন্ন্যাসী বম্‌ বম্‌ ক'রে গাল বাজাতে বাজাতে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হ'লেন। সন্ন্যাসী এসেই বল্‌লেন—তিনি রাজার পায়ের গোদ সারিয়ে দিতে পারেন।

লোকজনেরা সন্ন্যাসীকে রাজার কাছে নিয়ে গেল।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন—'মহারাজ, আপনার পা ভালো হ'য়ে যাবে—ভয় নেই। কিন্তু এক্ষুণি আমার তু-একটা জিনিস চাই। আর-একরাজ্যের আর-এক রাজার সিংহাসনের তলার এক ডেলা মাটি আনার হুকুম দিন্। ঐ মাটি আন্‌তে হবে এক-রাত্রের মধ্যে আর এক-নিঃশ্বাসে,—সেই রাজ্যেরই একটা বেলপাতায় ক'রে।'

সন্ন্যাসীর ওষুধের কথা শুনে সবাই অবাক্! বেল-পাতায় ক'রে মাটির ডেলা আনা শক্ত নয়; কিন্তু ডেলাটা হওয়া চাই আর-এক রাজার সিংহাসনের নীচ থেকে তোলা, আর তা আন্‌তে হবে এক-রাত্রের মধ্যে—এক-নিঃশ্বাসে! 'কলির হনূমান্ কে আছে রে, বাবা!—অসম্ভব, এ অসম্ভব'—ব'লে রাজসভার সবাই মুখ-চাওয়া-চাওয়ি কর্‌তে লাগ্‌ল।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন—'তা না হ'লে কাজ হবে না।'

রাজা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে মন্ত্রীর দিকে তাকাতে লাগ্‌লেন।

মন্ত্রী বল্‌লেন—'মহারাজ, সন্ন্যাসী যে-ওষুধ চাচ্ছেন এখনই তা মিল্‌তে পারে। কাশীর রাজার সিংহাসন তো এই রাজসভাতেই আছে। তাই তো আর-একরাজ্যের আর-এক রাজার সিংহাসন। এর তলা থেকে এক ডেলা মাটি

তোলা আর কতক্ষণের কাজ ! কিন্তু সেই রাজ্যেরই বেলপাতায় ক'রে তা আন্‌তে হবে, সে-ই তো মুস্কিল !'

মন্ত্রী সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস কর্‌লেন—'বেলপাতাটা আলাদা এক রাজ্যের হ'লে কি চলে না ?'

সন্ন্যাসী বল্‌লেন—'কেন ?'

মন্ত্রী সন্ন্যাসীকে কাশীরাজ্যের সিংহাসনের কথা বুঝিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—'সে-রাজ্যে বেলগাছ তো আর নেই, কেটে সাবাড় করা হয়েচে।'

সন্ন্যাসী বল্‌লেন—'আর কাশীর রাজার সিংহাসন ? তা এখন কোথায় ?'

মন্ত্রী রাজার পায়ের তলার সিংহাসনখানা সন্ন্যাসীকে দেখিয়ে দিলেন।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন—'মহারাজ, এ যে ধর্ম্মের কলে নাড়া পড়েচে ! আপনি কাশীর রাজার সিংহাসন কেড়ে এনে তার অপমান কর্‌তে চেয়েছিলেন, তার টানেই আপনার মানেও যেতে বসেচে। ঐ গোদা পা নিয়ে জন্মের মত কাশীর রাজার সিংহাসনেই আট্‌কে থাক্‌তে চান, না, ছাড় পেয়ে আগেকার মত নিজের সিংহাসন নিয়ে থাক্‌তে পার্‌লেই খুশী ? জানেন তো, কাশীর আসল রাজা কে ?—বিশ্বনাথ নিজে। নামে রাজা ধর্ম্মদত্ত তাঁরই হ'য়ে রাজ্য চালান। যে-সিংহাসনের তলায় লোকে মাথা কুট্‌তে ছুটে যায়, আপনি তাতে

রেখেছেন পা! আর যা দিয়ে লোকে বিশ্বনাথের পূজা করে তা-ও আপনি সাবাড় ক'রে রেখেচেন! আপনার অহঙ্কারের বোঝা তাই তো গোদের মত আপনার পায়ে চেপে বসেচে,—আপনার নড়াচড়ার সাধ্য কি! তবে এখনও আর-এক উপায় আছে—এখনই নিজের পায়ে নিজে লুটিয়ে পড়ুন, আর রাজ্যশুদ্ধ সবাইকে নিয়ে ঐ সিংহাসনের তলায় মাথা কুটুন্। আপনার মনের অহঙ্কার দূর হ'লেই পায়ের গোদও সেরে যাবে,—নইলে, রক্ষা নেই।'—বল্‌তে বল্‌তে সন্ন্যাসী আকাশ-পাতাল জুড়ে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথার জটা কেউটে সাপের মত লিক্ লিক্ করতে লাগ্‌ল, হাতের ত্রিশূল আকাশের মাথায় ঝক্ ঝক্ ক'রে উঠ্‌ল; আর তাঁর মুখ থেকে মেঘের ডাকের মত শব্দ উঠ্‌তে লাগ্‌ল—বম্ বম্ বম্!

সেই বম্ বম্ শব্দ কর্‌তে কর্‌তে সন্ন্যাসী চোখের পলকে কোথায় মিলিয়ে গেলেন!

... ...

উগ্রধরের চমক ভাঙ্গ্‌ল। তিনি কাশীর রাজার সেই সিংহাসনের ওপর মাথা রেখে লুটিয়ে পড়্‌লেন। রাজসভার সমস্ত লোকও ছুটে এসে সেই সিংহাসনের তলায় মাথা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'জয় কাশীরাজের জয়!'

সন্ন্যাসী আকাশ-পাতাল জুড়ে দাঁড়ালেন—৯০ পৃষ্ঠা

দেখ্‌তে না-দেখ্‌তে রাজার পায়ের গোদ কোথায় মিলিয়ে গেল।

...　　　...　　　...

উগ্রধর আবার রাজ-দরবার ক'রে কাশীর রাজার সিংহাসন কাশীরাজ্যে রেখে আস্‌বার হুকুম দিলেন। একশো আটটা হাতীর মিছিল ক'রে সে-সিংহাসন কাশীরাজ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হ'লো।

সেই হ'তে কাশীরাজ্যের আর কোশলরাজ্যের লড়ায়েরও শেষ হ'লো।

ঘেরোর
হাকিমী

হেবোর হাকিমী

ঘুঁটে-কুড়ুনির ছেলে হেবো,—দেখ্‌তে-শুন্‌তে যেমন হাবাগোবা, কাজেও তাই ; তার ওপর আবার কুঁড়ের বাদ্‌শা,—চল্‌তে-ফির্‌তে যেখানে-সেখানে লট্‌কে ব'সে পড়ে, আর কথায় কথায় হিঃ হিঃ ক'রে হেসেই অস্থির।

বারমাস ত্রিশদিন ঘুঁটে-কুড়ুনির খাটুনির অন্ত নেই,—নইলে মা-পোয়ের খোরাকী জোটায় কে? কিন্তু বুড়ো বয়সে শরীরেই বা কত সয়! ঘুঁটে-কুড়ুনি ত্যক্তবিরক্ত হ'য়ে একদিন হেবোকে বল্‌ল—'আমি গতর খাটিয়ে সব জুটিয়ে-পুটিয়ে এনে মুখের গোড়ায় ধ'রে দেবো, আর বুড়ো-ছেলে ঘরে ব'সে ব'সে হাঁ ক'রে গিল্‌বে! কেন, ধারিমদ্দ হয়েচ, দুটো পয়সা রোজগার ক'রে আন্‌তে পার না!'

হেবো হিঃ হিঃ ক'রে হেসে উঠে বল্‌ল—'আমি রোজগার কর্‌তে পারি না, তুমি ভেবেচ নাকি?—বেশ,

দাও না আমায় একটা ঘোড়া এনে!—একটা ঘোড়া পেলে

তাতে চ'ড়ে বিদেশে গিয়ে আমি কত রোজকার ক'রে আনি, দেখে নিয়ো।'

ঘুঁটে-কুড়ুনি বল্‌ল—'আহাহা, বাঁচি না অভাগীর ব্যাটার কথা শুনে! কথায় বলে না—

পেটে পড়ে না শাক-চচ্চরি,—
গপ্প মারেন দই!
কল্‌কে টেনে তামাক খান,—
গড়গড়াটা কই!

এ-ও শুন্‌চি তাই! রাজপুত্তুর পক্ষীরাজ-ঘোড়ায় চ'ড়ে দিগ্বিজয়ে যাবেন!···মর্ মর্! দু-পয়সার মুরোদ নেই, চড়্‌তে চায় ঘোড়ায়! বেশ তো, যা না, শহরে তো ঘোড়ার আকাল নেই,—ঘর ছেড়ে একবার ন'ড়ে শহরে গিয়ে ঘোড়া জোগাড় ক'রে নে না।'

মায়ের কথা শুনে হেবো ভাব্‌ল—তাই তো! তা হ'লে তো একবার শহরে গেলে হয়। শহরে যখন ঘোড়ার আকাল নেই, তখন সেখানে গেলে একটা ঘোড়া জোটাতে কতক্ষণ!

বরাবরই হেবোর ঘোড়ায় চড়ার ভারী সখ। তার ছোটবেলায় তাদের গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে কে একবার ঘোড়ায় চ'ড়ে গিয়েছিল। তাই তখন সে দেখেছিল। সেই হ'তে তার মনের সাধ—একটা ঘোড়া পায় তো, তাতে চ'ড়ে দেশ-বিদেশে চক্কর মেরে ফেরে!

মায়ের কথায় তাই সে ঠিক কর্‌ল, শহরে গিয়ে রাস্তাঘাট থেকে একটা ঘোড়া জোগাড় ক'রে আন্‌বে।

তারপর সত্যিই একদিন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে সে শহরের দিকে হেঁটে চল্‌ল।

... ...

শহরে গিয়ে হেবো দ্যাখে—সত্যিই সেখানে ঘোড়ার আকাল নেই। কিন্তু আগে সে যে ভেবেছিল, আমগাছতলায় পাকা আম যেমন প'ড়ে থাকে—এ-ও বুঝি তাই; এসে দ্যাখে তা তো নয়! রাস্তাঘাটে কোথায় ঘোড়া প'ড়ে আছে যে ধ'রে নিলেই হ'লো! যে-ঘোড়াটা এক্‌লা চল্‌চে তার পিঠেও মানুষ, আবার জোড়ায় জোড়ায় মিলে যেগুলো বাক্সের মত কি টেনে নিচ্ছে তার ওপরেও মানুষ।...কিন্তু ঘোড়ার পর ঘোড়া, —কত ঘোড়াই না শহরে আছে!—হেবো অবাক্‌ হ'য়ে রাস্তার পাশে লট্‌কে ব'সে প'ড়ে হাঁ ক'রে ঘোড়া দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

কিছুক্ষণ পরে সেখানে এক টেটন এসে উপস্থিত। হেবোকে রাস্তার পাশে লট্‌কে ব'সে থাকৃতে দেখে টেটন এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌ল—'কি হে বাপু, তুমি এখানে ব'সে কি কর্‌চ?'

হেবো বল্‌ল—সে ঘোড়া দেখ্‌চে,—তার একটা ঘোড়া চাই কিনা, তাই।

টেটন বল্‌ল—'ঘোড়া চাই ?—তা রাস্তায় ব'সে কেন ?···কত দামের মধ্যে ঘোড়া কিন্‌বে, বলো তো ?—আমি তোমাকে ভালো ঘোড়া জুটিয়ে দেবো।'

দামের কথা শুনে হেবো মাথা চুল্‌কুতে লাগ্‌ল। ঘোড়ার দাম যে কত হয়, তা তো তার জানা নেই। হাটবাজারে যে-সব জিনিস বিকোতে দেখে তার দাম দু-চার পয়সাই সে জানে; তাই কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে সে বল্‌ল—'চার পয়সার একটা ঘোড়া চাই।'

টেটন ভাব্‌ছিল—যে-লোক ঘোড়ার খদ্দের তার কাছে কোন্ দশ-বিশ গণ্ডা টাকা না আছে!—দাঁও মার্‌তে পারে তো মোটা কিছু বরাতে জুট্‌বে।···কিন্তু টোকা দিতে গিয়ে ত্যাখে—এ আস্ত বোকা! নইলে কেউ চার পয়সার ঘোড়া কিন্‌তে চায়! এমন বোকার কাছে আর কি-ই বা জুট্‌বে! ···যাক্, চোরের রাত্তিরবাসই লাভ!—চারটে পয়সাও হাতে আসে তো মন্দ কি!—এই-না ভেবে টেটন বল্‌ল—'তুমি চার পয়সার ঘোড়া চাও? এ-দামে যে পক্ষীরাজ-ঘোড়া পেতে পার! যে-সব ঘোড়া এই রাস্তাঘাটে দেখ্‌চ, তা সমস্তই জঙ্গ্‌লী দিশী জাতের ঘোড়া! এত দাম দেবে একটা দিশী ঘোড়া কিন্‌তে! তার চেয়ে এক কাজ কর। আমার কাছে পক্ষীরাজ-ঘোড়ার ডিম আছে। তার একটা তোমাকে এনে দিচ্ছি। সে ডিম দু-দিন ঘরে রাখ্‌লেই ফুটে আস্‌ল

পক্ষীরাজের ছানা বেরুবে। তোমার কাছে আমি লাভ কর্‌তে চাইনে,—চার পয়সায়ই তা দেবো,—দাও তো আমাকে পয়সা চারটে।'

হেবো পক্ষীরাজ-ঘোড়ার নাম শুনেচে, আর এ-ও শুনেচে, পক্ষীরাজ-ঘোড়ায় চ'ড়ে আকাশে ওড়া যায়। সেই পক্ষীরাজ-ঘোড়ার ডিম চার পয়সায় পাওয়া যাবে শুনে মনে মনে সে খুশী হ'লো। কিন্তু, মুস্কিলের কথা—সেই চারটে পয়সাই বা কই?···হেবো বল্‌ল—'আমার কাছে তো এখন পয়সা নেই। তুমি পক্ষীরাজ-ঘোড়ার ডিমটা আমাকে দাও,—ডিম ফুটে ছানা হ'লে পক্ষীরাজ-ঘোড়ায় চ'ড়ে আমি রোজগার ক'রে তোমাকে দাম দেবো।'

আরে ছ্যাঃ! চারটে পয়সাও কাছে নেই!—এ তো আচ্ছা মক্কেল রে!—আবার বলে কিনা—রোজগার কর্‌বে পক্ষীরাজ-ঘোড়ায় চ'ড়ে!···লোকটা পাগল নাকি!—এই-না ভেবে টেটন হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে গেল। আর যাওয়ার সময় ব'লে গেল—'আমার নগদ কারবার, বাপু। পয়সা নিয়ে আর-একদিন নয় এখানে এসো। তখন তোমাকে পক্ষীরাজ-ঘোড়ার ডিম দেবো।'

হেবো ভাব্‌ছিল—আগে ঘোড়ায় চ'ড়ে পরে রোজগার কর্‌বে। টেটনের কথা শুনে বুঝ্‌ল—রোজগার না হ'লে

পক্ষীরাজ-ঘোড়ার ডিম মিল্‌বে না। তখন তার ভাব্‌না হ'লো —কি ক'রে চারটে পয়সা রোজগার করে।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে এক সদাগরের দোকানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'লো।

সদাগর দোকানের সাম্‌নে বসেছিল। হেবো তাকে দেখে জিজ্ঞেস কর্‌ল—'এখানে কোথায় রোজগার করা যায়, বল্‌তে পার?'

সদাগর বল্‌ল—'রোজগার করবে?—এস না এখানে। দু-চারটে মালপত্তর টেনে দিয়ে যাও, এখনই দু-পয়সা রোজগার হবে।'

হেবো বল্‌ল—'দু-পয়সা দিয়ে আমি কি করব! আমার চার পয়সা রোজগার করা চাই।'

সদাগর বল্‌ল—'বেশ, চার পয়সাই নয় পাবে। কিন্তু চার পয়সা দিয়ে কি কর্‌বে, বলো দেখি?'

হেবো বল্‌ল—সে একটা পক্ষীরাজ-ঘোড়ার ডিম কিন্‌বে। চার পয়সার কমে তা পাওয়া যাবে না।

হেবোর কথা শুনে সদাগর তার বুদ্ধির দৌড় বুঝে নিল। সে তাড়াতাড়ি উঠে হেবোকে কাছে ডেকে এনে বল্‌ল— 'তুমি পক্ষীরাজ-ঘোড়ার ডিম চাও? আর তা কিন্‌বে নগদ পয়সা দিয়ে? কেন রে, বাপু! নগদ পয়সায় ডিম কিন্‌লে, তারপর ডিমটা নষ্ট হ'য়ে গেল, তখন পক্ষীরাজ-

ঘোড়া কোথায় পাবে? এদিকে পয়সা-কে পয়সাও গেল, ওদিকে পক্ষীরাজও জন্মের আগেই ফুড়ুৎ কর্‌লেন! তখন যে হবে সকল নষ্ট! তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর না! আমি তোমাকে পক্ষীরাজ-ঘোড়ার জ্যান্ত ছানা দেবো, তুমি আমার মালটালগুলো টেনে দাও দেখি। জান তো, পক্ষীরাজ-ঘোড়ার জ্যান্ত ছানার দাম কত! কিন্তু দাম তোমার কাছে আমি চাইনে। তোমার আমার দেনাপাওনা কাটাকাটি হয়ে চুকেবুকে যাবে। মাঝে থেকে তুমি পক্ষীরাজ-ঘোড়ার জ্যান্ত একটী ছানা পাবে।'

কয়েকটা মালপত্তর টেনে পক্ষীরাজ-ঘোড়ার জ্যান্ত ছানা পাওয়া যাবে—শুনে হেবোর মহাফূর্ত্তি। সে সদাগরের কথায় রাজী হ'য়ে তখনই হেঁইয়ো হেঁইয়ো ক'রে মাল-টানা সুরু ক'রে দিল।

সন্ধ্যার সময় কাজ শেষ হ'লো। সদাগর হেবোর পিঠ চাপ্‌ড়িয়ে বাহবা দিতে দিতে তার হাতে দিল একটী নেংটী-ইঁদুরের ছানা। সঙ্গে সঙ্গে ব'লে দিল—'এটা আস্‌ল পক্ষীরাজ-ঘোড়ার জাত। ছানা কিনা, তাই এখনও ক্ষুদে দেখ্‌চ। বাড়ী নিয়ে গিয়ে দু-পাঁচদিন দুধ-কলা খাইয়ে দেখো এতটুকু ছানাটাই হ'য়ে উঠ্‌বে কত বড় পক্ষীরাজ! তখন এর ঘাড়ে হবে দেড় হাত লম্বা ঝুঁটি, তিব্বতী গাইয়ের চামর ঝুল্‌বে ল্যাজে, আর কাঁধের দু-দিকে বেরুবে

দু-দুখানা ময়ূরপঙ্খী-ডানা! পক্ষীরাজ হ্রে-ত্রে ক'রে ডাক্‌বে,
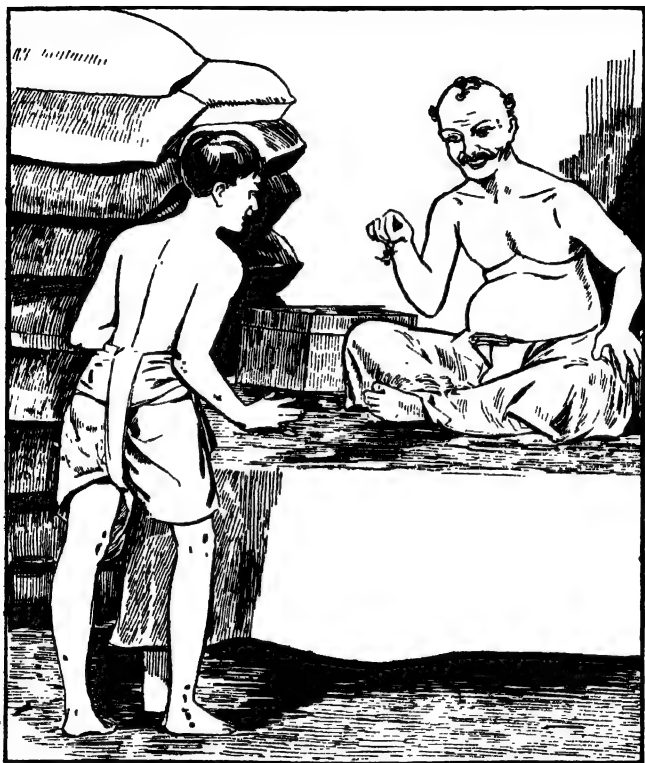
সদাগর হেবোর···হাতে দিল···নেংটা-ইঁদুরের ছানা—১০২ পৃষ্ঠা

আর ময়ূরপঙ্খী-ডানা নেড়ে ফুড়ুৎ ক'রে তোমাকে নিয়ে আকাশে উঠ্‌বে।'

সদাগরের কাছ থেকে নেংটী-ইঁদুরের ছানা নিয়ে হেবো মহা-আহ্লাদে বাড়ীতে ফিরে চল্‌ল।

... ...

যেতে যেতে হেবো এক গেরস্ত-বাড়ীর দরজায় গিয়ে উপস্থিত হ'লো। এতক্ষণ হেঁটে হেঁটে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল, গেরস্ত-বাড়ীর দরজায় গিয়ে জিরুতে ব'সে পড়্‌ল। আর বস্‌ল তো, সেখানেই ব'সে ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

এর মধ্যে গেরস্ত-বাড়ীর বেরাল দরজায় এসে ছ্যাখে একটা ইঁদুর-ছানা। বেরাল এক-লাফে ইঁদুর-ছানার ঘাড় কাম্‌ড়ে ধ'রে কোঁৎ ক'রে তাকে গিলে ফেল্‌ল।

হেবো ঘুম থেকে উঠে ছ্যাখে ইঁদুর-ছানা নেই! সে হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল—'ওরে আমার পক্ষীরাজ-ঘোড়া কে নিল রে! আমি এখন কিসে চ'ড়ে রোজগার কর্‌ব!'

হেবোর কান্না শুনে গেরস্ত-বাড়ীর সবাই দরজায় ছুটে এল। হেবো বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তাদের সকল কথা খুলে বল্‌ল।

গেরস্ত-বাড়ীর কর্ত্তাটী ছিলেন বড় ভালো মানুষ। আর তাঁর হাতী-ঘোড়ারও অভাব ছিল না। সমস্ত ব্যাপার বুঝ্‌তে পেরে তিনি হেবোকে শান্ত ক'রে বল্‌লেন—'কেঁদে না, বাছা। তোমাকে আমি একটা ঘোড়ার বাচ্চা দিচ্ছি।

তাই নিয়ে ঘরে ফিরে যাও।'—এই ব'লে তিনি হেবোকে একটা ঘোড়ার বাচ্চা এনে দিলেন।

এবার সত্যি-ঘোড়া পেয়ে হেবোর আনন্দ ছ্যাখে কে! সে এক-লাফে সেই ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে তখনই বাড়ীর দিকে রওনা হ'লো।

... ...

বাড়ীর কাছে গিয়েই হেবো ঘুঁটে-কুড়ুনিকে ডাক্‌তে লাগ্‌ল—'মা, মা, আমি ঘোড়া নিয়ে এসেচি। দেখো, এখন হ'তে তোমাকে কত রোজগার ক'রে এনে দেই।'

ছেলের গলা শুনে ঘুঁটে-কুড়ুনি ছুটে ঘরের বার হ'য়ে ছ্যাখে—সত্যিই তো!—ঘোড়ার পিঠে হেবো!

মহা-আহ্লাদে তখন সে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে পাড়ার লোক জড়ো কর্‌ল।

পাড়ার লোকেরা হেবোকে ঘোড়ার পিঠে দেখে অবাক্! তারা বল্‌ল—'নিশ্চয়ই হেবো হাকিম হয়েচে। নইলে, দারোগার মত ঘোড়ায় চ'ড়ে আস্‌বে কেন!'

হেবো ভাব্‌ল—তাই তো! ঘোড়ায় চ'ড়ে থাকে ব'লেই তো দারোগা দেশের হাকিম। তারও তো ঘোড়া হয়েচে, হাকিমীর আর বাকী কি!

এরপর হেবোকে ঘোড়া থেকে নামায় কে? হাকিমের মত দিনরাত সে ঘোড়ায় চ'ড়েই আছে।

রোজ তাকে ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়াতে দেখে গাঁয়ের লোকে[র] মনে সন্দেহ রইল না—সবাই তাকে হাকিমের মত ভয় ক[রতে] লাগ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে সবাইর কাছে হাকিমের মা ঘুঁটে-কুড়ু[নি]র বা খাতির-যত্ন কত !

... ...

দু-চার বছর বাদে হেবোকে হেবো বল্‌লে চিন্‌তই বা কে? তখন তার নামটীও হ'লো হবুচন্দ্র।

... ...

এরপর আগেরই মত হবুচন্দ্র যদি চল্‌তে-ফির্‌তে যেখা[নে] সেখানে লটুকে বস্‌তে চাইত তো হবুর মা—'আহাহা !' ক'রে ছুটে আস্‌ত; বল্‌ত—'হবু-বাবা, তুমি হ'লে দে[শের] হাকিম,—আমার সোনার চাঁদ ছেলে। তুমি কেন যেখা[নে] সেখানে বস্‌বে? তুমি রূপার খাটে পা মেল্‌বে, সো[নার] খাটে বস্‌বে।'

আবার আগেরই মত হবুচন্দ্র যদি কথায় কথায় হিঃ [হিঃ] ক'রে হেসে উঠ্‌ত তো আশেপাশের লোকজনেরাও [তার] সঙ্গে হাস্‌তে থাক্‌ত, আর বলাবলি কর্‌ত,—'আ[হা] দেখেচ, কেমন মানুষটী!—যেমন রসিক তেম্‌নি তাঁর [মিঠে] হাসিটী!'